# আজব শিশু

মূলঃ দার্শনিক ইবনে তোফায়েল আন্দালুসী

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

# আজব শিশু

(ইসলামী দার্শনিক ইবনে তোফায়েল আন্দালুসীর "হাই ইবনে ইয়াক্জান" অবলম্বনে)

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

# আজব শিশু

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

প্রকাশক
মোহাম্মদ নূর উল্লাহ
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর, ১৯৯৯ইং

**দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী/২০০২**

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি (প্রিন্টিং প্রেস) লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৬৯২০১।

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

**মূল্য ঃ ৪৫.০০ টাকা**

**প্রাপ্তিস্থান ঃ**
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
৭২, জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
১৫০-১৫১, গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা।
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

---

AJAB SHISU : Written by Muhammad Fariduddin Khan, Published by Muhammad Nur Ullah, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125, Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price Tk. 60.00 US$ 3/-
ISBN-984-493-052-9



www.pathagar.com

# লেখকের কথা

ছোট বন্ধুরা!

খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয় কাহিনী 'আজব শিশু' রচিত হয়েছে মূল আরবী গ্রন্থ 'হাই ইবনে ইয়াকজান' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে। ওই কাহিনীর লেখক জগত বিখ্যাত দার্শনিক ও কবি ইবনে তোফায়েল আন্দালুসী। তাঁর পুরো নাম আবুবকর মুহাম্মদ বিন আবদুল মালেক বিন তোফায়েল আন্দালুসী। তিনি আন্দালুসীয়া তথা বর্তমান স্পেনে ৪৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ ও ৫৮১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। দার্শনিক ইবনে তোফায়েল অনেক বই রচনা করেছেন। তবে তাঁর রচিত হাই ইবনে ইয়াকজান (জাগরণের পুত্র জীবন) দুনিয়া জোড়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। আমরা গ্রন্থটির নাম দিয়েছি 'আজব শিশু'। একেও আমরা অনুবাদ করেছি ফার্সী ভাষা থেকে। হাই ইবনে ইয়াকজান-এর কাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় বহুবার বহুরূপে অনুদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। দার্শনিক ইবনে তোফায়েল তাঁর এ গ্রন্থে আদম সন্তান তথা মানবজাতির স্বভাব চরিত্রে নিহিত বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলোকে অদ্ভুত এক কাল্পনিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে প্রমাণ করে দেখাতে চেয়েছেন। মানব শিশু আসলেই আল্লাহপাকের এক আজব ও সেরা সৃষ্টি। মানুষ যে সর্বোত্তম সৃষ্টি তার প্রমাণ এ কাহিনীর মাধ্যমে আমরা আকর্ষণীয়ভাবে বুঝতে পারি। ইবনে তোফায়েল জোর দিয়ে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, মানব শিশু যদি একাকী কোন জনমানবশূন্য দ্বীপে পশু-পাখির সাথেও বড় হয় তথাপি তার ভেতর আল্লাহ যে সমস্ত সেরা গুণ-বৈশিষ্ট্য তথা বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি দিয়েছেন তা দিয়ে সে নিজেকে একদিন সেরা হিসেবেই দাঁড় করাবে। তার সাথে আর কারো জুড়ি নেই। এমনকি সে মানব সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে দূরে থেকেও সৃজনশীল প্রতিভার মাধ্যমে প্রকৃতির উপর বিজয় অর্জন ও প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহর জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম। তোমরা এ কাহিনীটা পড়েই দেখো আমার কথা ঠিক কিনা।

কাহিনীটা পড়ে তোমাদের হয়তো মনে পড়বে রবিনসন ক্রুসোর গল্পের কথা। রবিনসন ক্রুসোর কাহিনী যদিও আকর্ষণীয় তথাপি আজব শিশু হাই ইবনে ইয়াকজানের কাহিনীর সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। কারণ রবিনসন ক্রুসো বনে-জঙ্গলে জীবন যাপন শুরু করে তরুণ বয়েসের শিক্ষা-দীক্ষা নেয়ার পর থেকে। আর আমাদের আজব শিশু নির্জন দ্বীপে এক বছর বয়স থেকেই গিয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের গল্পের শিশুটি তখনো দুগ্ধপোষ্য কোলের শিশু। দু'গল্পের মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আবার অনেকের ধারণা ষোড়শ শতকে লেখা রবিনসন ক্রুসোর কাহিনী আসলে আরো কয়েকশ' বছর আগে তথা দ্বাদশ শতকে লেখা ইবনে তোফায়েলের কাহিনী থেকেই নেয়া। এছাড়া ইবনে তোফায়েলের লেখাটি প্রাচীনতম হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী ও এশীয় বৈশিষ্ট্যময়।

দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বহু তত্ত্ব সমৃদ্ধ হাই ইবনে ইয়াকজানের কাহিনীকে ছোটদের ও সর্বসাধারণের বোঝার উপযোগী করে উপস্থাপনা করা হয়েছে। আশা করি এ বইটি বাংলা ভাষী শিশু, কিশোর ও অভিভাবকদের মন জয় করতে পারবে। আর হ্যাঁ, পড়তে গিয়ে কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি ও সংশোধনী থাকলে তা আমাদের কিন্তু জানাবে। তাতেই বইটি আরো সুন্দর হবে। বইটি পড়ে তোমরা আনন্দ ও উপকার পাবে এটাই আমার ও প্রকাশকের কামনা।

সুন্দর ও আদর্শ মানুষ হও– এ দোয়া করি।

**– মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান**



www.pathagar.com

# প্রকাশকের কথা

শিশু-কিশোরেরা গল্প খুবই ভালবাসে। গল্পের মাধ্যমে তাদের কাছে শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় অনেক দৃষ্টান্ত সহজেই সার্থকভাবে তুলে ধরা যায়। যা পরবর্তী জীবনে আদর্শ জীবন গঠনে সহায়তা করে। কিন্তু বাজারে প্রচুর গল্পের বই প্রকাশিত হলেও শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনের সহায়ক এ ধরনের গল্পের বইয়ের দারুণ অভাব রয়েছে। বাজারে যে সব গল্পের বইয়ের ছড়াছড়ি রয়েছে তা শিশু-কিশোরদের কচি মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নৈতিকতা বিরোধী বিজাতীয় দর্শনে প্রভাবিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে বিনোদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উপায় বিদ্যমান থাকায় শিশু-কিশোরদের পাঠাভ্যাসও ধীরে ধীরে আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। এ জন্যে সচেতন নাগরিকদের ন্যায় আমরাও উদ্বিগ্ন।

সুতরাং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়, আমাদের ভবিষ্যত নাগরিকদের এই বিজাতীয় দর্শন থেকে রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব থেকেই শিশু-কিশোরদের উপযোগী বই প্রকাশে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। ইতোমধ্যেই দেশের খ্যাতনামা ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা সংস্থা বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ শিশু-কিশোরদের উপযোগী বেশ কিছু বই প্রকাশ করেছে। এই মহৎ উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় আমরা এবার প্রকাশ করছি ইসলামী সভ্যতার এককালীন প্রাণকেন্দ্র আন্দালুসিয়া তথা বর্তমান স্পেনের জগৎ বিখ্যাত দার্শনিক ও আলেম ইবনে তোফায়েল আন্দালুসী-এর খ্যাতনামা গ্রন্থ 'হাই ইবনে ইয়াকজান'। অনুবাদক মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান এর নামকরণ করেছেন 'আজব শিশু'।

বইটি অভিভাবক ও শিশু কিশোরদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম ও আয়োজন সার্থক হবে।

আল্লাহ হাফেজ।

**মুহাম্মদ নূর উল্লাহ্**
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি



www.pathagar.com

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ১। | অচেনা দ্বীপে আজব শিশু | ১ |
| ২। | পশুদের সাথে আজব শিশু | ১০ |
| ৩। | আদম সন্তান তার চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগায় | ২৪ |
| ৪। | সৃজনশীল কর্মমুখর মানব সন্তান | ৩৮ |
| ৫। | আদম সন্তানের সাথে আদম সন্তান | ৪৮ |
| ৬। | আদমন সন্তান, ভাষা ও সংস্কৃতি | ৬২ |




www.pathagar.com

# অচেনা দ্বীপে আজব শিশু

সেকালে কিশতি চড়ে সমুদ্র ভ্রমণ সহজ কথা ছিল না। তখনও যন্ত্রচালিত জাহাজ তৈরী হয়নি। পালচালিত কিশতিগুলো ছিল সহজ সরলভাবে তৈরী। বায়ুর মতিগতির উপর নির্ভর করতো কিশতির চলাচল। যখন সমুদ্রে বায়ুর জোর থাকতো না কিংবা উল্টো বায়ু প্রবাহ থাকতো তখন ওসব পালের জাহাজ চালানো দুরূহ হয়ে পড়তো।

এ ধরনের পালের কিশতি চড়ে দূর-দুরান্তে পৌঁছতে অনেক অনেক সময় লাগতো। সমুদ্রে ঝড়-তুফান হলে তো কিশতি ডুবে যাওয়ারও আশঙ্কা বেশী দেখা দিতো। তাই সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে বসবাসকারী লোকেরা যারা সমুদ্র দেখেনি তারা সমুদ্র ভ্রমণে খুব ভয় পেতো। বাধ্য না হলে কিশতিতে সওয়ার হতো না। তবে যারা সমুদ্রের কূলে বসবাস করতো তারা রীতিমতো কিশতি চড়া ও সমুদ্র ভ্রমণ করতো এবং সমুদ্র ভ্রমণের মাধ্যমে বহু ফায়দা লাভ করতো।

ইয়াকজান ছিলেন সেকালের একজন নাবিক। ভারতবর্ষের এক বিরাট দ্বীপে ছিল তাঁর বসবাস। ইয়াকজানের ছোট পরিবারে ছিল তাঁর স্ত্রী, বারো বছরের এক ছেলে, দশ বছরের এক মেয়ে ও এক বছরের আরেকটি ছেলে। সে তখনো মায়ের দুধ পান করতো।

সমুদ্রের উপকূলের এক শহরে ছিল ইয়াকজানের বাড়ি। নাবিক ইয়াকজান অবশ্য বেশীরভাগ সময়ই সমুদ্রে কাটাতেন। তাঁর পালের কিশতি যোগে সে বিভিন্ন নদী ও সমুদ্র বন্দরে মালামাল আনা নেয়া করতেন। নিজ বন্দরে কখনো আসলে তিনি দিন কতেক তাঁর ছেলেমেয়েদের সাথে কাটিয়ে যেতেন। এরপর আবার চলে যেতেন সমুদ পথে।

একদিন ইয়াকজান এসে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, জানো কী হয়েছে?

স্ত্রী ঃ কী হলো? নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?

ইয়াকজান ঃ নতুন একটা কাজ পেয়েছি। সমুদ্রের ওপারে পশ্চিমা বন্দরগুলোতে গিয়ে কিছুকাল কাজ করতে হবে। কিন্তু তোমাদের ফেলে সেখানে একা থাকা বড় কষ্টকর।



www.pathagar.com

স্ত্রী ঃ তোমার এ সফর কতো দিনের?

ইয়াকজান ঃ আল্লাহ্ মালুম! আবহাওয়া কী রকম থাকে, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যাওয়া ও আসায় কতোদিন লাগবে এবং সেখানে কতোদিনে কাজ শেষ হবে তা বলা কঠিন। তবে ছ'মাসের আগেতো ফেরা যাবে না।

স্ত্রী ঃ এ সফরে না গেলে কী নয়? কাজের তো আর অভাব লাগেনি!

ইয়াকজান ঃ কী যে বলো! কাজ থাকবে না কেনো? তবে ছোট কাজে কম ফায়দা আর বড় কাজে বেশী ফায়দা। দূর-দুরান্তের সফরে কেরায়া বেশী পাওয়া যায়। আমার কাজইতো দরিয়ার মাঝে। সমুদ্র ও দরিয়াকে ভয় পেলে কী আর নাবিক হতে পারতাম?

ইয়াকজানের ছেলে ও মেয়ে বলে উঠলো ঃ বাবাতো ঠিকই বলছেন।

স্ত্রী ঃ ভয়ের কথা নয়। বরং সমুদ্রের বিপদাপদের কথা বলছি। লোকে বলে সমুদ্রের মাঝামাঝিতে খুবই বিপজ্জনক। মানুষের কাজ হচ্ছে যতো দূর সম্ভব বড় বড় বিপদ থেকে দূরে থাকা।

ইয়াকজান ঃ কেউ যদি বিপদের চিন্তা করে তাহলে বিপদ সবখানেই আছে। বন-জঙ্গল, মরু-বিয়াবান, পাহাড়-পর্বত, শহর-গঞ্জ সবখানেই বিপদ ঘটতে পারে। বিপদতো শুধু দরিয়াতেই লুকিয়ে থাকে না। কোথাও বাঘ নেকড়ে, কোথাও শীত বরফ, কোথাও বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র বিরাজ করছে। কিশতি ডুবে যাওয়ার কথাও ওসব বিপদ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। কোনদিন হয়তো কিশতিও ডুবে যেতে পারে। এ ধরনের কোন বিপদতো শহর এবং নিজ বাড়িতেও ঘটতে পারে। কেউ হয়তো মই থেকে পড়ে যেতে পারে, কারো গায়ে আগুন লেগে যেতে পারে, কারো ঘর অসাবধানতাবশতঃ আগুনেও পুড়ে যেতে পারে। যাই বলো না কেনো মানুষ চিরকাল বাঁচবে না। তবে যদ্দিন বাঁচবে তদ্দিন তাকে নির্ভীক হয়েই বাঁচা উচিত। সাবধানতা ভালো জিনিস। কিন্তু কেউ যদি বিপদে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে তবে কোন কাজেই সে হাত দিতে পারবে না। আমাদের তো আর জমিদারী নেই যে, ঘরে বসে বসে খেতে পারবো। আমাদের কাজ করতেই হবে, জীবন যাপন করতে হবে। আমাদের কাজই হলো দরিয়াকে নিয়ে। এই যে বলে দীল দরিয়া এর অর্থ ওই দুঃসাহসী অন্তর যা আমাদের থাকতেই হবে। দীল দরিয়া মানুষ দরিয়ার বিপদে ডরায় না।



www.pathagar.com

ছেলে মেয়েরা বললো ঃ বাবার কথাই ঠিক।

স্ত্রী ঃ তাহলে তুমি তোমার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছো। আশা করি আল্লাহ আমাদের সবার মঙ্গল করবেন। এ ছাড়া বলার কী আছে!

ইয়াকজান ঃ আসল বিষয় হচ্ছে এই যে, এই দীর্ঘ সময় আমি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারবো না। তাই এ সফরে তোমাদেরও নিয়ে যেতে চাই। সবাই মিলে সমুদ্র ভ্রমণও করবো, দেশ বিদেশও দেখবো এবং রুজী-রোজগারও করবো। এরপর ইনশাআল্লাহ ফিরে আসবো।

ছেলেমেয়েরা আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললো ঃ বাহ্‌বা! কী মজা! সমুদ্র ভ্রমণ! বহু দূর-দুরান্তে যাবো! কতো দেশ দেখবো। এরচে মজা আর কী হতে পারে?

স্ত্রী ঃ সবই ঠিক। কিন্তু আমাদের দুধের বাচ্চা রয়েছে। তোমার মালবাহী কিশতিতে কি করে এ বাচ্চার দেখাশুনা করবো? পুরুষরা সন্তান লালন পালনের সমস্যার কিছুই বোঝে না।

ইয়াকজান ঃ এ আবার কেমন কথা? আমরা কী বাচ্চাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিতে চাই! আমাদের খোদা তাঁরও খোদা। আমি ইয়াকজান, তুমি ইয়াকজানের বউ, বড় দুটাও ইয়াকজানের ছেলেমেয়ে আর বাচ্চাও হাই বিন ইয়াকজান। সেও আদম সন্তান। অন্যান্য আদমের মতো সেও কিশতি চড়ে বেড়াবে। কিশতিও ঘরেরই মতো। ফারাক কিসের? যা কিছু প্রয়োজন সব নিয়ে যাবো। সবাই এক সাথে থাকলে কোন চিন্তাই থাকবে না। তুমি তো সব সময় বলতে, পুরুষরা কখনো ঘর-সংসারে থাকে না। এখন আমি চাই কয়েক মাস ঘরে থাকতে। আর সে ঘর হচ্ছে আমাদের কিশতি।

স্ত্রী ঃ আমার আপত্তি নেই। আল্লাহ যা চান তাই হবে। তোমার সাথে থাকতে পারলে আমিও খুব আনন্দ পাবো।

ছেলে ও মেয়ে ঃ আমরাও খুশী হবো। নতুন নতুন শহর দেখবো, আরো কতো কিছু দেখবো!

সবাই তৈরী হয়ে গেলেন। যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে সবই সাথে নিলেন। প্রায় মাসখানিকের খাদ্য সামগ্রী, পানীয় জল সবই কিশতিতে উঠানো হলো। ইয়াকজানের বড় ছেলে বড় মেয়েও নিজেদের বই, খাতাপত্র, কলম, পেন্সিল, জ্যামিতি বক্স, খেলনা সামগ্রী গুছিয়ে কিশতিতে উঠালো। একদিন তাঁরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছ



www.pathagar.com

থেকে কয়েক মাসের জন্য খোদা হাফেজী করলেন। কিশতি উপকূল ছেড়ে ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললো দূর দ্বীপের পথে।

আবহাওয়া ছিল অনুকূলে আর সমুদ্র ছিল শান্ত। পালের টানে শোঁ শোঁ বেগে কিশতি সমুদ্রের বুক চিড়ে এগুতে থাকে রাজহাঁসের মতো। ইয়াকজান, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের খুশী আর ধরে না। কিশতিতে রান্নাবান্না করা আর এক সাথে খাওয়া-দাওয়ার খুশী ও আনন্দ যেনো উপচে পড়ছে সবার।

পরদিন যোহরের সময় তাঁরা পৌছে গেলো একটি ছোট দ্বীপে। ইয়াকজান কিশতি ভেড়ালো উপকূলে। একটি বড় নারিকেল গাছের সাথে কিশতিকে বেঁধে তাঁরা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লো দ্বীপে। ইয়াকজান বললেন, দ্বীপটি কোথাকার আমরা জানি না। এ দ্বীপে জনমানব, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার কি আছে তাও জানা নেই। সুতরাং সবাই সাবধানে থাকবে। কোন পশু হামলা করলে সবাই একসাথে প্রতিরক্ষা করবো। তবে বড় কোন বিপদ দেখা দিলে তাড়াতাড়ি কিশতিতে পৌছে যাবো।

এরপর তাঁরা উপকূলের নিকটেই অবস্থিত উঁচু টিলাটিতে উঠে গেলেন। টিলার উপর থেকে দ্বীপের চারপাশই নজরে পড়লো। দ্বীপটি খুবই ছোট ছিল। সামান্য কিছু গাছপালা ও লতাপাতা ছাড়া কোন প্রাণী আছে বলে মনে হলো না। কিছুক্ষণ থেকে তাঁরা কিশতিতে ফিরে এলেন। দ্বীপের আবহাওয়া গরম হয়ে পড়েছিল। কিশতি আবার তাঁর সমুদ্র যাত্রা শুরু করলো। এভাবে কয়েকদিন পথ চললো। আর কোন দ্বীপ দেখা গেল্রো না। যদ্দূর চোখ যায় শুধু অথৈ পানি আর পানি। দূরে চারদিকে নীল আকাশ যেনো নেমে এসেছে নীল দরিয়ার পানিতে। মাঝে শুধু এ কিশতি ও তাঁর আরোহীরা আপন মনে এগিয়ে চলেছে নিরুদ্দেশের পথে।

একদিন ভোরে দেখা গেলো নীল আকাশের এক কোণে কালো মেঘ। দেখতে দেখতে মেঘের পর্দা ছড়িয়ে পড়লো সারা আকাশে। এরপর শুরু হলো বৃষ্টি। দুপুরের পর থেকে দরিয়ায় তুফান উঠলো। ইয়াকজান কিশতির পালগুলো নামিয়ে ফেললেন। কিন্তু দরিয়ার উত্তাল তরঙ্গমালায় কিশতি যেনো কাগজের নৌকার মতো উঠানামা এবং এপাশ ওপাশ দোল খাওয়া শুরু করলো। ধীরে ধীরে ইয়াকজানের বাচ্চাদের মনে ভয় ঢুকতে লাগলো। মা বাচ্চাদের বললেন ঃ দরিয়াতে এ জিনিসটাই খারাপ। স্থলে এসব মোটেও নেই।



www.pathagar.com

ইয়াকজান ঃ না, এতে আবার খারাপের কি পেলে? তোমরা এসব দেখোনি বলে অস্বস্তি বোধ করছো। মানুষ যা কম দেখে তাঁর প্রতিই খারাপ মনোভাব পোষণ করে। আমরা এসব ঝড়-তুফান ও ঢেউ-তরঙ্গ বহু দেখেছি। এক দু'ঘন্টা পর আবার সমুদ্র শান্ত হয়ে যাবে। স্থলেও ভূমিকম্প হয়, আগুন লাগে, ঝড়-তুফান দেখা দেয় আরো কতো কী! দরিয়া শান্ত হলে দেখবে তুফানের পর কী স্বাদ পাওয়া যায় দরিয়ার বুকে। এখন কিশতিকে মনে হচ্ছে শিশুদের দোলনা। দোলনায় দোলা দিলেই বাচ্চারা শান্ত হয়, কান্না থামায়। ছোট্ট শিশু যখন দোলনার দোলায় আরাম পায়, আনন্দ পায় তখন আমরা কেনো কিশতির দোলায় নারাজ হবো? দেখো, দেখো! আমাদের ছোট্ট মনিটি কিশতির দোলায় কীভাবে খিলখিল করে হাসছে! তার সারা গায়ে যেনো খুশীর ঢেউ।

সত্যি হাই বিন ইয়াকজান আনন্দে হাত-পা ছুড়ে মারছিলো। অন্যরা ভয় পেলেও সে আওয়াজ তুলে কলকল করে হাসছিল।

ঘন্টা দুয়েক পর সমুদ্র শান্ত হলো। বৃষ্টিও থেমে গেলো। আবারো পাল উড়িয়ে ইয়াকজান বললেন ঃ এইতো ছিলো আবার শেষও হয়ে গেলো। যে কোন তুফানেই যদি কিশতি ডুবে যেতো তাহলে পানির উপর কোন কিশতিই বাকী থাকতো না!

ছেলেমেয়েরা বললো ঃ তুমি ঠিকই বলছো। কিন্তু আমরা অনেক ভয় পেয়েছিলাম।

ইয়াকজান ঃ তোমাদের কথাও ঠিক। তোমরা যে এখনো সমুদ্রে অভ্যাস করো নি, দরিয়া দীল হয়ে উঠোনি। ধীরে ধীরে তোমাদের ভয়ও চলে যাবে। অভিজ্ঞতা না থাকলে মানুষ নতুন সব কিছুতেই ভয় পায়। তবে জীবনে চলতে গেলে সাহস দরকার। বুঝলে!

আরো পনেরো দিন পাড় হয়ে গেলো। এর ভেতর তাঁদের কিশতি কয়েকটি ছোট দ্বীপের পাশ ঘেষে এসেছে। তাঁরা কোথাও নামেনি। এসব দ্বীপ ছিলো কালো পাথরে ঢাকা। ইয়াকজান জানালেন ঃ এসব দ্বীপ আসলে আগ্নেয়গিরির পাহাড়। নিভে না গেলে দ্বীপগুলো ক্রমশঃ অনেক বড় হতো এবং সেখানে দেখতে দেখতে গাছপালা জন্মাতো ও জীবনের পদচারণা শুরু হয়ে যেতো।

এরই ভেতর কয়েকবার ঝড়-তুফান দেখা দিলো। তবে কেউ আর তেমন ভয় পেলো না। বেশীর ভাগ সময় কিশতি এতোই শান্তভাবে এগুচ্ছিলো যে, খাবার সময় থালা বাসনের পানিতেও কোন ঢেউ ও কম্পন উঠতো না। তাঁদের পথ কিন্তু তখনো



www.pathagar.com

অনেক বাকী ছিল।

এক রাতে হঠাৎ সাগরে ঝড় উঠলো। প্রবল বৃষ্টির সে রাতটি ছিল মিসমিসে কালো। কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। ক্রমশঃ তরঙ্গমালা ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করে কিশতিকে দারুণভাবে দোলা দিতে লাগলো। সবার মনেই ভয় ঢুকে গেলো। কিশতির বাতি এক দমকা বাতাসে নিভে গেলো। এর পরপরই পাহাড়সম এক ঢেউ এমনভাবে কিশতির উপর আছড়ে পড়লো যে, কিশতির তলায় বড় ফাটল ধরে গেলো। ফাটল দিয়ে কলকল বেগে কিশতির ভেতর পানি ঢুকতে শুরু করলো।

ইয়াকজান বুঝতে পারলেন কী বিপদই না ঘটে গেলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা মোটেও ভয় পেয়ো না। কিছুই হয়নি। মনে হচ্ছে কিশতির ভেতর ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি ঢুকছে। কিশতি এতে এক সময় ডুবে যেতে পারে। আমরা জীবন বাঁচানোর জন্যে ব্যবস্থা করবো। প্রয়োজন হলে সব মালপত্রের আশা ছাড়তে হবে। জীবন বাঁচানোর চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই। উপকূল খুবই নিকটে। সবাই কিশতির গায়ে বাঁধা নৌকাটিতে উঠে পড়ো।

আসলে ইয়াকজান মিথ্যা বললেন। নিকটে উপকূলের কোন চিহ্নই ছিল না। তিনি এ জন্যেই মিথ্যা বললেন যাতে স্ত্রী-পুত্র ও মেয়েরা ভয় পেয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে না পড়ে। কিশতি দেখতে দেখতে তলিয়ে যাচ্ছিলো। উত্তাল ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে সবারই তখন মাথা ধরে চক্কর খাচ্ছিল। সবাই কোনক্রমে নিজেদের আত্মরক্ষাকারী নৌকা তথা লাইফবোটে গিয়ে পৌঁছালো। এ ধরনের বিপদের সময় মানুষ মূল্যবান সবকিছুর কথা ভুলে গিয়ে যার যার প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু মায়েদের অবস্থা ভিন্নতর। নিজের প্রাণ গেলেও সন্তানদের কথা ভুলতে পারেন না। নৌকাটিতে সবার শেষে যিনি উঠলেন তিনি হলেন ইয়াকজানের স্ত্রী। তিনি কোলের শিশুটিকে বুকের দুধ খাইয়ে দোলনার উপর শুইয়ে দিলেন। এরপর কিশতি থেকে নৌকায় পা রেখে দোলনাটিসহ শিশুকে নৌকায় উঠানোর চেষ্টা চালালেন। দরিয়ার ভয়ঙ্কর তরঙ্গমালায় কিশতি ও নৌকা এতোই এদিক ওদিক দোল খাচ্ছিল যে, দোলনাটি নৌকায় উঠানো খুবই সংকটপূর্ণ হয়ে পড়লো। ইয়াকজান জানপ্রাণ চেষ্টা করে নৌকাটিকে কিশতির কাছে ধরে রাখছিলেন। ছেলে ও মেয়ে পেছন থেকে মায়ের কাপড়-চোপড় টেনে ধরে তাকে সাহায্য করছিলো। আচমকা এক পাহাড়সম ঢেউ এসে মায়ের হাত থেকে দোলনাটিকে ছো মেরে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। দোলনা পানিতে ভাসতে লাগলো।



www.pathagar.com

মুহূর্তের ভেতর নৌকা ও দোলনার দূরত্বও বেড়ে গেলো অনেক। মা চিৎকার করে উঠলেন ঃ ইয়াকজান! দোলনাটি ধর! ছুটে গেছে! ইয়া আল্লাহ! আমার ছেলেকে বাঁচাও! আমার ছেলে ডুবে যাচ্ছে। হে খোদা! তুমি একে নাজাত দাও!

এরপর মা ভয়ে ও আতঙ্কে বেহুশ হয়ে নৌকার উপর পড়ে গেলেন। ইয়াকজান প্রাণপণে চেষ্টা চালালেন নৌকাটিকে দোলনার কাছে পৌছাতে। কিন্তু ঘূর্ণাবর্তের স্রোতে দূরত্ব বেড়ে চললো। নৌকার নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাত থেকে ছুটে গেলো। প্রবল স্রোতই ইচ্ছে মতো নৌকাটি নিয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে কাঠ ও খড় দিয়ে তৈরী দোলনাটিও একটি ছোট ভেলার মতো ভেসে চললো সাগরের অথৈ উত্তাল পানিতে।

নৌকা ও দোলনার দূরত্ব ক্ষণে ক্ষণে অনেক বেড়ে যাচ্ছিল।

ইয়াকজান ছিলেন দুরন্ত সাঁতারু। আল্লাহর নাম নিয়ে ঝাঁপ দিলেন পানিতে। দোলনার দিকে ছুটে চললেন তিনি। ঢেউয়ের ধাক্কায় একবার ডুবে যাচ্ছিলেন আবার ভেসে উঠছিলেন। দ্রুত হাত-পা চালাচ্ছিলেন এ ভয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্তে। ফল কিছুই হলো না। তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর শক্তি ফুরিয়ে ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসছেন। তাঁর ছেলে ও মেয়ে চিৎকার করে ডাকলো ঃ



www.pathagar.com

বাবাজান! বাবাজান! তুমি ফিরে এসো। আমরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনে।

ইয়াকজান চিন্তা করলেন, দোলনার নাগাল পাওয়াতো দূরের কথা খোদ নৌকাটিও এখন বিপদাপন্ন। এ তিনজনের জান বাঁচানো ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ মুহূর্তে যখন দোলনার নাগাল পাওয়ার আশা ছাড়তে হলো তখন বলে উঠলেন ঃ "হে খোদা! আমার শিশু সন্তানকে তোমার হাতে সোপর্দ করলাম। তুমি তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও! তুমি তাকে রক্ষা করো!"

এরপর তিনি বহু কষ্টে নিজেকে নৌকায় পৌছালেন। ছেলে ও মেয়ে তাঁকে হাত ধরে টানলে তিনি উঠে বসলেন নৌকায়। কিন্তু কেউ নৌকা চালাতে পারছিলো না। নৌকা ঢেউয়ের সাথে সাথে উঠানামা করছিল। দোলনাটি অন্ধকার সাগরের বুকে ক্রমশঃ মিলিয়ে গেলো। ইয়াকজান কিছুই করতে পারলেন না। এদিকে তাঁর স্ত্রীও বেহুশ হয়ে পড়ে আছেন নৌকার উপর।

পরদিন ভোরে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লো সারা আকাশে। সমুদ্র তখন একেবারে শান্ত। তবে কিশতিরও কোন চিহ্ন দেখা গেলো না দোলনারও কোন খোঁজ পাওয়া গেলো না। দরিয়ার ভয়াল তুফান ও স্রোত নৌকাটিকে নিয়ে এলো ভিন্ন দিকে আর দোলনাটিকে নিয়ে গেলো আরেক দিকে। তাঁরা ভাবলো দোলনাটি নিশ্চয়ই গহীন সাগরে ডুবে গেছে। বাচ্চার মায়ের হুশ ফিরে এলে দুধের শিশুর জন্যে কান্না ও ফরিয়াদ জুড়ে দিলেন। কিন্তু করারই বা কী ছিল। অবশেষে তাঁদের নৌকা উপকূলে গিয়ে ভিড়লো। এদের ভাগ্যই গেলো বদলে। পাঁচজন কিশতিযোগে সমুদ্র ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। এখন চারজন

www.pathagar.com

পৌঁছলেন কূলে। হাই বিন ইয়াকজানকে তাঁরা হারালেন।

আল্লাহর কী অপার লীলা! মাছুম বাচ্চার দোলনাটি সাগরের এক ক্ষীপ্র গতিসম্পন্ন স্রোতের টানে পড়ে দূর-দুরান্তের এক অজানা পথে রওয়ানা হলো। অবশেষে তুফান ও স্রোতে ভাটা পড়লে দোলনাটি গিয়ে ঠেকলো ভারত মহাসাগরের এক অজানা অজ্ঞাত দ্বীপের কূলে। কোন জনমানুষতো এ দ্বীপে ছিলই না বরং বহু বছর যাবৎ কেউ এ দ্বীপের খবরই পায়নি। সাগরের ঢেউ ও জোয়ারের ঠেলায় দোলনাটি গিয়ে ঠেকলো দ্বীপের নরম বালিকাময় বেলাভূমিতে। ভাটায় উপকূলের পানি নেমে গেলো অনেক অনেক দূরে! ইয়াকজানের পুত্র হাই ছিল এ অজ্ঞাত দ্বীপের প্রথম মানুষ, পয়লা আদম সন্তান। আল্লাহর অসীম করুণা ও ইচ্ছায় এ আদম সন্তান জীবিতাবস্থায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ডাঙ্গায় পৌঁছে গেলো।

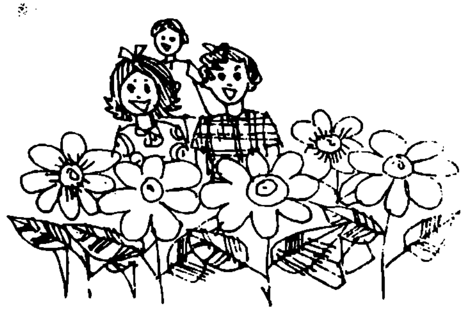



www.pathagar.com

# পশুদের সাথে আজব শিশু

রোদে উপকূলের ভেজা বালি মাটি দ্রুত শুকিয়ে গেলো। বাতাসে বালি নড়েচড়ে উড়ে উড়ে দোলনার আশপাশ ভরে ফেললো। মায়ের দুধ না পেয়ে শিশুটির তখন দারুণ ক্ষুধা। ক্ষুধার্ত শিশু কান্না ছাড়া কীইবা করতে পারে! এ আদম সন্তানের কান্নাই ছিল দ্বীপটিতে প্রথমবারের মতো উচ্চারিত মানুষের কণ্ঠস্বর! হাই বিন ইয়াকজানের কান্না আর থামছিলো না। কে থামাবে এ ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না!

এদিকে একটি হরিণ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তাঁর বাচ্চাকে। হরিণের কয়েকদিনের বাচ্চাটিকে মায়ের অজ্ঞাতে এক ঈগল পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। হরিণী তার বাচ্চার জন্যে এদিক ওদিক দৌড়ে ফিরছিলো। তার স্তনে ছিল প্রচুর দুধ। দুধের ভারেও সে কষ্ট পাচ্ছিল। বাচ্চার খোঁজে এক সময় হরিণী চলে এলো সাগরের পাড়ে।

হরিণীর কানে যখন মানব শিশুর কান্না এসে পৌঁছলো তখন সে অস্থির হয়ে পড়লো। নিজের বাচ্চা মনে করে দৌড়ে গেলো দোলনার কাছে। মায়ের দরদী মন তাকে উতলা করে



www.pathagar.com

তুললো। দোলনার ভেতর ঢুকে পড়ে সে বাচ্চাটিকে শুঁকতে লাগলো। হরিণ ভাবলো এটি বোধ হয় তারই বাচ্চা। কোন কারণে তার চেহারা ও গলার আওয়াজ বদলে গেছে। হরিণ শিশুর গায়ে নিজের পরশ বুলানো শুরু করা অবস্থায় হাই ইবনে ইয়াকজান একেই নিজের মা মনে করে হাতড়িয়ে যা পাওয়ার তা পেয়ে গেলো। হরিণীর স্তনে হা করে মুখ লাগিয়ে চুষতে শুরু করলো অমিয় সুধা। হরিণী তার বাচ্চা চাচ্ছিল আর মানব শিশুও দুধ চাচ্ছিল।

হরিণীর স্তন কিছুক্ষণ টানার পর আদম সন্তান শান্ত হলো।

হরিণ এরপর শিশুর মুখমন্ডল শুঁকে ওর উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাসে আনন্দিত হলো। কিছুক্ষণ শিশুর পাশেই শুয়ে রইলো। কিন্তু আবারো তার মনে পড়লো তার বাচ্চার কথা যার চেহারা ঠিক তারই মতো। প্রতিটি প্রাণীই তার নিজের বাচ্চাকে সর্বাধিক ভালবাসে। হরিণ আদম সন্তানকে একা রেখে বেরিয়ে পড়লো দোলনা থেকে। দ্বীপের ঝোপঝাড়, টিলা, প্রান্তর ঘুরে খুঁজতে লাগলো তার বাচ্চাকে। জঙ্গলের কিনারা পর্যন্ত সে খুঁজলো। ওখানে হিংস্র পশুদের শব্দ শুনতে পেয়ে ভয় পেয়ে গেলো। কোথাও তাঁর বাচ্চার কোন সন্ধান পেলো না। সন্ধ্যার দিকে তার স্তনে আবারো

www.pathagar.com

দুধের ভারে ব্যথা শুরু হলো। তারই প্রয়োজন তাকে টেনে নিয়ে গেলো সাগর পারে দোলনার কাছে।

মানব শিশুও ক্ষুধা তেষ্টায় কান্না জুড়ে দিয়েছিলো। আবারো মা-শিশু পরস্পরের পরশ পেয়ে শান্ত হলো।

হরিণী তার এ নতুন অবস্থায় বেশ আনন্দিত। কিন্তু তার বাচ্চাটি যে তার সাথে সাথে ঘুরতে পারছে না, হাঁটাহাঁটি করতে পারছে না! শুধু ঘুমানো, বসা, হাত-পা নেড়ে খেলা করা, কান্না করা ও দুধ খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারছিল না। এমনকি সে তার দোলনার বাইরেও আসতে পারছে না। বাধ্য হয়ে হরিণী দোলনাতেই থাকা শুরু করলো। যখন সে ঘাস লাতপাতা খাওয়ার জন্যে দূরে যেতো তখনই শিশুটি অস্থির হয়ে পড়তো, দোলনায় হাত-পা ছুঁড়ে মারতো। সে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইতো।

প্রয়োজনই চেষ্টার জননী। শিশুটির একমাত্র প্রয়োজন ছিল পথ চলা। সে দোলনার দেয়ালে ধরে উঠে পড়লো। এভাবে কিছু চেষ্টার পরই দাঁড়ানো শিখলো। সে দেখতে দেখতে অন্যান্য মানব শিশুর তুলনায় অনেক আগেই একা একা দাঁড়ানো শিখে ফেললো। হরিণী মা তাকে কখনো ভুলে গেলো না। ভুলে যাওয়া সম্ভবও ছিল না। সেও কিছুর অভাব বোধ করতো। শিশুটির সাথে থাকলেই সে আনন্দ পেতো।

একদিন হরিণী শিশুটির জামার কলার কামড়ে ধরে তাকে দোলনার ভেতর থেকে বের করে আনলো। আদম সন্তান তখন হাত-পা দিয়ে হামাগুড়ি চলা শিখেছে। উভয়েই আনন্দিত। হরিণও যেমন কথা বলতে জানে না আদম সন্তানও কথা বলতে জানে না। হরিণ তার নিজ ভাষায় শিশুর সাথে আওয়াজ করতো। স্বভাবতঃ মানব শিশু যা শুনে ও যা দেখে, তাই অনুকরণ করতে শিখে। মানব সমাজেও দেখা যায় যেসব শিক্ষিত পরিবার শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলে তাদের সন্তানরাও সেরকম শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলা শিখে নেয়। আবার যেসব অজ্ঞ মা-বাবা অশুদ্ধ ও আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে তাদের সন্তানরাও তাদেরই মতো অশুদ্ধ ও আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্তা বলা শিখে নেয়। হাই বিন ইয়াকজানও হরিণীর আওয়াজ একে একে শিখে নিতে লাগলো। প্রতিটি আওয়াজের অর্থ ও তাৎপর্য ছিল আলাদা আলাদা। হরিণ যখন ক্ষুধার্ত থাকতো, ভরা পেটে থাকতো, আনন্দে থাকতো, কষ্টে থাকতো, ভয়ে থাকতো, বাচ্চাকে আদর করতো, কিংবা তাকে দূরে তাড়িয়ে দিতো তখন নানা


www.pathagar.com

ধরনের আওয়াজ করতো। মানব শিশুও সে সব শিখে নিলো।

হরিণ তার নিজ সন্তানের কথা একেবারেই ভুলে গিয়ে মানব সন্তানকে তার সন্তান বলে মনে করে বসলো। একদিন তাকে ধীরে ধীরে নিয়ে গেলো নিজের আবাসে। হরিণের বাসাটি ছিল এক টিলার উপর অবস্থিত একটি গুহায়। গুহাটিতে সূর্যের আলো তেমন প্রবেশ করতো না। হরিণের চোখ সেই অন্ধকারেও ভাল দেখতো। আদম সন্তানও ওই অন্ধকারে দেখা অভ্যাস করে নিলো। কেউ যখন কোন কিছু অভ্যাস করে ফেলে তখন সহজে এর ভাল কিংবা মন্দ বুঝতে পারে না।

মানুষ যখন আরাম আয়েশে বড় হয় তখন সে ননীর পুতুল হয়ে গড়ে উঠে। কিন্তু যখন তার নাগালে ওসব আরাম আয়েশ থাকে না তখন শক্ত ও দৃঢ় হয়ে গড়ে উঠে। এ কারণেই দেখা যায় শহর, গ্রাম, পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গলে লালিত মানুষের মাঝে রয়েছে অনেক তফাৎ ও ব্যবধান। প্রত্যেকেই তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বড় হয়। আমাদের কাহিনীর এ আদম সন্তানও তার এ নয়া অবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না।

দিনের বেলা হরিণ ঘুরে বেড়াতো মাঠে ময়দানে সবুজ গাছ-গাছালীর ঝোপ ঝাড়ে। আদম সন্তানকেও সাথে নিয়ে যেতো। কিন্তু আদম সন্তান ঘাস ও লতাপাতা খেতে পারতো না। যদ্দিন হরিণীর বুকে দুধ ছিলো তদ্দিন সে দুধ খেয়েছে। কিন্তু যখন দুধ কমে এলো তখন তার ক্ষুধা তাকে বাধ্য করলো তার হরিণ মায়ের দিকে তাকাতে। সে হরিণের মতো ঘাস ও লতাপাতা খাওয়া শিখলো। তবে সে এক ঘাস মুখে দিয়ে যখন দেখলো মজা লাগে না তখন অন্য ঘাস মুখে দিতো। তাও মজা না লাগলে আরেক জাতের ঘাস মুখে দিয়ে দেখতো আগেরগুলোর চেয়ে ভাল মনে হচ্ছে। এভাবে সে লেটুস পাতা, শালগম পাতা, আঙ্গুর পাতা, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, পালং শাক, টমেটো প্রভৃতি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুললো। আখের গাছ চিবুতে গিয়ে তার আনন্দ দেখে কে!

বাহ্‌বা, কতো মজা! সে এভাবে বহু সুস্বাদু ও মজাদার শাকসবজী চিনে নিলো। হরিণীর সাথে সাথে ঘুরলেও মায়ের মতো সব কিছু খেতে পারতো না। বরং সে তার পছন্দ মতো শাক সবজী বেছে বেছে খেতো। দুধ যখন খেতো তখন তা ছিল হাই বিন ইয়াকজানের পরিপূর্ণ খাবার। কিন্তু এখন এসব প্রাকৃতিক খাওয়া খেতে গিয়ে তার তৃষ্ণা পেতো। তাই সে হরিণীর মতোই কতক্ষণ পরপর ঝর্ণার পাশে গিয়ে পানি খেয়ে



www.pathagar.com

আসতো। দু'জন দু'জনার সাথী ও সহকর্মী ছিলো।

আর এভাবে আদম সন্তান বড় হতে লাগলো। সে দু'পায়ের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটাহাঁটি ও দৌড়া দৌড়ি করা শিখে ফেললো। সে কথা বলতে পারতো না। তবে হরিণীর আওয়াজ তার খুব পরিচিত ছিল। আস্তে আস্তে সে বুঝতে পারছিলো যে, এ হরিণীটি দারুণ সরল সোজা! সব সময় এক স্থান থেকে পানি পান করে, সব সময় এক মাঠেই ঘুরে বেড়ায়, গাছের ডালপালার নড়াচড়াকেও ভয় পায়, তবে ভীষণ দ্রুত দৌড়ায়, সে তার সাথে দৌড়িয়ে পারে না। তবে সে গাছের উপর উঠে যেতে পারে কিন্তু হরিণীর হাতে পায়ে শক্ত খুর থাকায় তার মতো গাছের উপর উঠতে পারে না। তার মনে প্রশ্ন– কেনো হরিণীর হাত-পায়ে খুর রয়েছে? তার হাতে কেনো সরু সরু আঙ্গুল রয়েছে? প্রশ্নের সে জবাব জানতো না। আদম সন্তান গাছে উঠলে হরিণী তার দিকে তাকিয়ে থাকতো। সে হরিণীর শিং ধরে উপরের দিকে টানতো আর বিশেষ ধরনের শব্দ করতো যার অর্থ এই ঃ "উপরে উঠে এসো! ভয় পেয়ো না। এই দেখো না আমি কেমন করে উঠে গেলাম! গাছ থেকে পড়ে যাবে না। আমি তোমায় ধরে রাখবো! উঠে এসো!" কিন্তু হরিণী গাছে উঠার চেষ্টাও করতো না। আদম সন্তান বুঝতে পারলো যে আর বেহুদা চেষ্টা করে লাভ নেই। সে গাছে উঠা শিখবেই না।

আদম সন্তান আরো একটি বিষয় বুঝতে পারলো এই যে, হরিণী গুহার ভেতরেই পেশাব-পায়খানা করে। তবে এর গন্ধ তত খারাপ নয়। কিন্তু নিজের পেশাব-পায়খানায় অনেক খারাপ গন্ধ থাকে। এ জন্যে একদিন সে গুহাটা পরিষ্কার করলো। এরপর থেকে সে আর গুহার ভেতর পেশাব-পায়খানা করতো না। বাইরে গিয়ে সেরে আসতো। তার মনে প্রশ্ন ঃ হরিণ কেনো এ বিষয়টা বুঝতে পারছে না? আদম সন্তান এ কথা ভেবে তাজ্জব হতো। সে হরিণকে অনেক কিছু বুঝানোর চেষ্টা করতো কিন্তু বহু কিছুই বুঝতো না।

আদম সন্তান হরিণীকে বুঝানোর জন্যে সাধারণ আওয়াজ ছাড়াও নিজ থেকে নানা ধরনের শব্দ আবিষ্কার করতো। "অ অ... হ হ ... ক ক... ফ ফ... ইত্যাদি। না, তাতেও কোন ফায়দা নেই। হরিণ যে আওয়াজ জানতো তাছাড়া আর কিছুই শিখতো না। আদম সন্তান মনে করতো অ অ শব্দ উচ্চারণ করলে হরিণী কাছে আসবে আর হ হ শব্দ করলে হরিণী সরে যাবে প্রভৃতি! হরিণী এসব শেখার কোন চেষ্টাই করতো না। রাতের বেলায় আদম সন্তানের হাত-পা যখন ঘুমের মাঝে হরিণের শরীরের নিচে


www.pathagar.com

চাপা পড়তো তখন গায়ের জোরে ধাক্কা না দিলে হ হ  শব্দেই সে সরে যেতো না। এরপর আবার সে হরিণীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়তো।

হরিণ শুধু একটি জিনিসই জানতো ঃ ঘাস খাও আর পানি খাও! এরপর এক জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড় আর সতর্ক থাকো ভয়ের কিছু যেনো না এসে পড়ে। কিন্তু আদম সন্তান এসবে সন্তুষ্ট ছিল না। মনে মনে ভাবতো ঃ কেনো এই হরিণ কখনো গাছে উঠতে পারে না? হ্যাঁ মনে পড়েছে, তার পায়ে যে শক্ত খুর রয়েছে! কিন্তু বড় জঙ্গলটিতে যায় না কেনো? আমাকে ওখানে নিয়ে যায় না কেনো? কেনো পানিতে গিয়ে গাটা ধুয়ে পরিষ্কার করে আসে না? কেনো... কেনো...?

আদম সন্তানের এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার কেউ ছিল না। সে আরো কতো চিন্তা-ভাবনা করতো। কতো জিজ্ঞাসা তার মনে। সেও যেমন কথা বলতে জানতো না, হরিণও তেমন চিন্তা-ভাবনা করতে পারতো না।

দ্বীপটি ছিল অনেক বড়। সব ধরনের গাছপালা, শাক সবজী, ফলমূল ও পশুপাখি ওতে ছিল। ছিল না শুধু মানুষ। আদম সন্তান মানুষ ও পশুতে কি তফাৎ তা বুঝতো না। তবে এতটুকুন বুঝতো যে, সে অন্যদের চেয়ে বেশী বুঝে, বেশী চিন্তা করতে পারে। সে বুঝতো যে, হরিণের কাছে তার প্রয়োজন রয়েছে। হরিণের ভালবাসা, তার সঙ্গ ও সহগামীতা, তার আওয়াজ, দেহের উষ্ণতা এসব তার খুবই প্রয়োজন।

এভাবে দ্বীপে আদম সন্তানের দু'বছর হয়ে গেলো। হাই বিন ইয়াকজানের পরনের সব কাপড় ইতোমধ্যে নষ্ট ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সূর্যের আলোতে তার গায়ের রংও তামাটে হয়ে পড়েছে। চুল হয়েছে অনেক বড়। তেলতেলে চুলে জটা ধরে গেছে। ঝর্ণার তীরে গেলে পানিতে সে নিজের ও হরিণের ছবি দেখতে পেতো। দু'জনের মাঝে কোন মিল ছিল না। তবে সে হরিণকে খুব ভালবাসতো। হরিণ যে তার মা এবং একমাত্র সহচর। হরিণও তাকে ভালবাসতো।

রাতের বেলায় দ্বীপে হিংস্র প্রাণীদের হাঁকডাক ছিলো ভয়ঙ্কর। কিন্তু আদম সন্তান তার মায়ের পাশে থেকে কিছুতেই ভয় পেতো না। দিনগুলো তার কাছে খুব ভাল লাগলো। দিনের বেলায় উজ্জ্বল আলোতে সে সবকিছু দেখতে পেতো। সূর্য তার খুবই পছন্দনীয়। সূর্য যখন থাকে তখন সব জায়গা উজ্জ্বল ও গরম আবার সূর্য যখন থাকে না সবকিছু অন্ধকার ও ঠান্ডা হয়ে যায়। তাই হাই বিন ইয়াকজান সূর্যকে খুব ভালবাসতো। যতক্ষণ সম্ভব সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতো। চোখ ধাঁধিয়ে আসলে



www.pathagar.com

বিরত হতো।

দিনের বেলায় অনেক পশুপাখি দূর ও কাছ থেকে তাদের সামনে আসতো। খরগোশ, ছাগল, ভেড়া, কচ্ছপ, বিড়াল, উটপাখি, হাঁস-মোরগ ইত্যাদি। তবে এরা কেউ হরিণের বন্ধু ছিল না। দেখতেও এর মতো নয়। হরিণ কোন কোন পশুকে ভয় পেতো। ওরা তাহলে কারা? আদম সন্তান ওসবের একটিকেও পছন্দ করতো না। প্রথম প্রথম এরূপই ছিল। সম্প্রতি সে দু'হাতে জোরে তালি বাজানো শিখলো। দেখতে পেলো জোরে তালি বাজালে অনেক পশুপাখি দূরে সরে পড়ে। ভয় পায়। সে ওদের ভয় পাইয়ে আনন্দ পেতো। কিন্তু কচ্ছপ দ্রুত পালাতে পারতো না। পাখিরা উড়ে উড়ে আসতো, বসতো, দানা খেয়ে-দেয়ে আবার চলে যেতো। হরিণ পাখিদের ভয় পেতো না বলে আদম সন্তানও ওদের ভয় পেতো না। অবশ্য ওদের আসা-যাওয়ার প্রতি হরিণের কোন খেয়ালই থাকতো না। তবে হরিণ ও সে যখন পাখিদের কাছে যেতো তখন পাখিরা পাখা মেলে পালিয়ে যেতো। পাখিদের মাঝে কবুতর, চড়ুই ও শালিকরাতো হরিণের শিং ও পিঠে এসে বসে পড়তো। কিন্তু আদম সন্তান ওসবের দিকে হাত বাড়িয়ে দৌড়ে গেলে ওরা উড়ে যেতো, সে ধরতে পারতো না।

আদম সন্তান বুঝতো না যে এরা কি, জমিনের বুকে কি করে বেড়ায়। একদিন ভাল করে লক্ষ্য করে দেখতে পেলো যে, ওরা ঘুরে ঘুরে ছোট ছোট দানা কুড়িয়ে খায়। সে তখন জমিনের বুকে নূয়ে ওসব দানা চিনে নিলো। ভাবলো ঃ এসব উড়ন্ত প্রাণী এতো ছোট জিনিসও খায়!

মানব শিশু যখন দেখলো তার প্রিয় পাখি কবুতরকে ধরতে পারছে না তখন সে কবুতরকে সাহায্য করতে চাইলো। সে মাটি থেকে কিছু দানা কুড়িয়ে জমা করলো। যখন কবুতরের ঝাঁক এলো তখন সে ওদের সামনে দানাগুলো রাখলো। এবার কবুতরগুলোর আর ভয় রইলো না, দানা খাওয়ার জন্যে মানব শিশুর পায়ের কাছে পর্যন্ত এগিয়ে এলো। কবুতরগুলোর নির্ভয় আনন্দ দেখে হাই বিন ইয়াকজানেরও আনন্দ পেলো। সে আবারো দানা ছুঁড়ে মারলো। ওরা তার চারপাশে নেচে নেচে দানা খেতে লাগলো। কবুতরগুলো আর তাকে ভয় পেলো না। ভাল কাজের ফলই তাই। ভাল কাজেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। মানব শিশু এ বিষয়টি বুঝে গেলো।

একদিন কবুতরদের ঝাঁক কাছে এলে সে মুঠিতে দানা নিয়ে এগিয়ে গেলো মাটিতে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে। কিন্তু একটি কবুতর লাফ দিয়ে তার হাতে বসে গেলো দানা



www.pathagar.com

খাওয়ার জন্যে। কবুতরকে সে ভালবাসে বলে এর পা ধরে ফেললো। কবুতর পাখা ঝাপটা মেরে ছুটে যেতে চাইলো। কিন্তু পারলো না।

আদম সন্তান কবুতরটিকে আদর করে তার বুকের কাছে চেপে ধরলো। কবুতরের উষ্ণ নরম শরীরের পরশ তার কাছে বেশ ভাল লাগলো। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সে কবুতরটিকে নিয়ে তার গুহায় চলে এলো। অন্ধকার গুহার ভেতর সে কবুতরটিকে নিজের পায়ের কাছে ছেড়ে দিলো। কবুতর কয়েকবার এদিক সেদিক ঘুরে বাকবাকুম, বাকুম শব্দ জুড়ে দিলো। মানব শিশুর কাছে এ ডাক বেশ ভাল লাগলো। সেও কবুতরের ডাক শিখে নিয়ে বাকবাকুম বলতে লাগলো। হরিণী এ কাজে বিরক্ত হলো না। আসলে এসবে সে একেবারেই বে-খেয়াল। সে তার জাবর কাটা নিয়েই ব্যস্ত।

রাত ঘুমে কেটে গেলো। সকালে গুহার বাইরের আলো এলে মানব সন্তান জেগে উঠলো। দেখতে পেলো তার প্রিয় কবুতরটি নেই। সকালের আলোতে কবুতর উড়ে গেছে গুহা থেকে। তার প্রশ্ন, রাতে কেনো গেলো না? কোন জবাব সে পেলো না। পরদিনও সে কবুতর ধরার চেষ্টা করলো এবং ধরেও ফেললো। এবার সে কবুতরটিকে গুহায় এনে ছেড়ে দিতেই কবুতর পাখা মেলে পালালো। তখন সে তার প্রশ্নের জবাব পেলো। কবুতর তাহলে রাতে পালায় না, কিন্তু দিনে পালায়। অবশ্য সে তখনো বুঝে উঠেনি যে, কবুতরের পায়ে কিছু দিয়ে বেঁধে রাখলে কবুতর পালাতে পারবে না। কার কাছ থেকে সে শিখবে এ কথা? তার চোখের সামনে যে কেউ কারো পা বেঁধে রাখেনি যাতে সে তা দেখে শিখতে পারবে।

একদিনের ঘটনা। খুব ভোরের কথা। হরিণ তখন বেরিয়ে গেছে। সে তখনো ঘুমিয়ে। হরিণ তাকে কখনো ঘুম থেকে জাগাতো না। সেই কেবল কখনো তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জেগে উঠলে হরিণকে জাগিয়ে দিতো। সেদিন হঠাৎ হরিণের কানে এক বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর শব্দ এলো। "ঘেউ ঘেউ... ঘেউ ঘেউ..." সে খুব ভয় পেয়ে দৌড়ে ফিরে এলো তার বাচ্চার কাছে। আদম সন্তান ঘুম থেকে জেগে উঠে বাইরে বেরুতে চাইলো। কিন্তু হরিণ তার মাথার চুল কামড়ে ধরে রাখলো। সে কখনো কুকুর দেখেনি। আজই প্রথম সে কুকুর দেখলো। কুকুর গুহার দিকে দাঁত বের করে এগিয়ে আসলো। এর কণ্ঠ কতো মোটা। মানব শিশু বুঝতে পারছিলো না কুকুর কি চাচ্ছে। হরিণ তার বাচ্চাকে গুহার অনেক ভিতরে ঠেলে দিয়ে নিজে এগিয়ে গেলো গুহার মুখে। কুকুরও এগিয়ে এলো। কিন্তু হরিণ তার শিং দিয়ে কুকুরকে হামলা


www.pathagar.com

করলো। কুকুরের পাজরে হরিণের শিং আঘাত হানলে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো কুকুর। সে ঘেউ ঘেউ করতে করতে সেখান থেকে ছুটে পালালো। মানব শিশু এসব কাছে থেকে দেখলো। তাহলে ঘেউ ঘেউ অর্থ এই! কেউ যদি কাউকে কষ্ট দিতে চায় তাহলে বলবে ঘেউ ঘেউ! তবে হরিণ কেনো ঘেউ ঘেউ করে না?

আদম সন্তান গুহার মুখে এগিয়ে এসে কুকুরের মতোই শব্দ করে উঠলো ঃ ঘেউ ঘেউ....। কুকুর তখন দূরে বসা ছিল। শব্দ শুনেই একবার ঘেউ ঘেউ করে জবাব দিলো। কিন্তু বসাতেই রইল। এদিকে হরিণ তার শিশুর দিকে রাগ করে তাকালো। সে শিং উঁচিয়ে শিশুর দিকে তাক্ করলো যেনো ঃ আমার বাচ্চা কেনো কুকুরের ডাক দেবে?

মানব শিশু চুপ করলো এবং এগিয়ে গেলো হরিণের দিকে। হরিণের কাছ থেকে শিখে নেয়া কায়দায় হরিণের গায়ে হাত বুলাতে লাগলো। হরিণ শান্ত হলো। শিশুটি বুঝতে পারলো যে, হরিণ ঘেউ ঘেউ শব্দে বিরক্ত হয়। ঘেউ ঘেউ অর্থাৎ আমি তোমার দুশমন, তোমার বন্ধু নই।

এরপর সে এলো বাইরে। দেখলো একই কুকুর কবুতরগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং একটি কবুতর ধরে ফেলেছে। সে দু'পায়ে কবুতরকে ধরে রেখে অপর দু'পা দিয়ে এর মাথাটা ছিঁড়ে ফেললো। এরপর কবুতরের পাখাগুলোও ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিয়ে কবুতরের গোশত খেয়ে ফেললো। মানব শিশু হরিণের কাছে গিয়ে এর শিং ধরে টেনে আনলো গুহা মুখে এবং কুকুরের কবুতর খাওয়া দেখালো। সে বলতে চাইলো, 'চেয়ে দেখো কবুতরকেও খাওয়া যায়।' কিন্তু হরিণ কিছুই বুঝলো না। এরপর আদম সন্তান নিজে নিজেই চিন্তা করে বের করলো ঃ কুকুর হরিণকে খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল। তেমনি হরিণও হয়তো আমাকে খেয়ে ফেলতে পারে। এরপর ভাবলো, 'না, হরিণ খুব ভাল। সে কবুতরের দিকে তাকিয়েও দেখে না। অন্যরাই খারাপ, একে অপরকে খেয়ে ফেলে।'

আদম সন্তান প্রতিদিন কিছু না কিছু শিখতে শুরু করলো। এখন তার বয়স পাঁচে পড়েছে। সে এখন বহু কিছু জানে। সে জানে যে, হরিণের পায়ে খুর আছে, মাথায় শিং আছে। সে ঘাস খায়, পশুপাখি ধরে খায় না এবং সে উড়তে পারে না। কবুতর ঘাস খায় না, ছোট ছোট দানা খায়, এর গায়ে পাখা ও পালক আছে এবং অন্যান্য পাখির মতো উড়তে পারে। কুকুর কবুতর ধরে খায়। তবে কুকুরের পায়ে শক্ত খুর



www.pathagar.com

নেই, আঙ্গুলও নেই, অবশ্য নখর থাবা আছে। এরপর সে নিজের হাতের আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, 'আমি ওদের সবারচে ভাল। ওরা সবাই দাঁত দিয়ে কোন কিছু ধরে খায়। কিন্তু আমি আমার হাত দিয়ে কতো কিছু করতে পারি।'

এদিকে হরিণী বুড়ো হয়ে পড়লো। আগের মতো সে আর বন-বাদাড়ে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে না। কিন্তু আদম সন্তান দিন দিন আরো চালাক, বুদ্ধিমান, আরো শক্তিশালী ও ক্ষীপ্র হয়ে উঠছিল। একদিন হরিণী অসুস্থ হয়ে পড়লো। সে হরিণীর আওয়াজের অর্থ বুঝতে পারতো। সেদিন হরিণী গুহাতেই শুয়ে রইলো এবং বললো ঃ "আমার অনেক ক্ষুধা পেয়েছে, আমি খেতে চাই।" আদম সন্তান হরিণীর শিং ধরে একে উঠাতে চাইলো, কিন্তু হরিণী উঠলো না বরং শব্দ করলো। অর্থাৎ আমি উঠতে পারছি না, আমার শরীর মোটেও ভাল নয়।"

আদম সন্তানের অন্তর হরিণীর জন্য কেঁদে উঠলো। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো এবং বুঝতে পারলো যে, "হরিণী এখন অনেক ভূখা। সে ঘাস খাওয়ার জন্যে বাইরে যেতে পারবে না। তবে এখানে ঘাস নিয়ে এলে সে খেতে পারবে।" সাথে সাথে মানব শিশু আনন্দে হাতে তালি বাজিয়ে উঠলো এবং গুহা থেকে বের হয়ে গেলো। সে ভাবলো ঃ "কবুতরকে যেভাবে গুহায় নিয়ে এসেছিল তেমনি ঘাসও নিয়ে আসা যাবে। আজবতো! এতক্ষণ কেনো এ কাজ করে ফেললাম না!"

সে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো মাঠে। হরিণী যেগুলো পছন্দ করে সেসব ঘাস তুলে নিয়ে এলো এবং হরিণীর সামনে রাখলো। হরিণীকে বিশেষ শব্দ করলো অর্থাৎ 'খাও!' উভয়ই তখন অনেক খুশী। হরিণীকে সে বলতে চাইলো ঃ "বেশ কাজ করেছি। একদিন তুমি আমাকে দুধ খাইয়ে বড় করেছিলে। আর আজ আমি তোমাকে ঘাস খাওয়াচ্ছি।" সেদিন থেকে আদম সন্তান বাইরে গেলেই ঘাস নিয়ে ফিরে আসতো। গুহার একটি স্থান ঘাসের গুদামে পরিণত হয়। হাই ইবনে ইয়াকজান শিখে নিয়েছে, কি করে গুহায় খাদ্য নিয়ে আসা যায়। খাদ্যের জন্য বাইরে যাওয়া জরুরী নয়। ঘরে বসেই সময় মতো জমানো খাদ্য খাওয়া সম্ভব। কিন্তু পানি কী করবো? পানিতো হাত দিয়ে আনা যায় না। হাত থেকে পড়ে যায়। ইস্! পানির একটি ধারা যদি এখানে গুহার কাছেই থাকতো। সে চিন্তা করতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে পড়লো গুহার বাইরে একটি লাউয়ের শুকনো খোলের ভেতর কিছু বৃষ্টির পানি জমে আছে। ওই লাউয়ের খোলটাতো গুহায় নিয়ে আসা যাবে। হরিণী যখন বাইরে যেতেই



www.pathagar.com

পারছে না আমিই তার জন্যে সবকিছু করে দেবো। সে তো ঘাস আর পানি ছাড়া আর কিছুই খায় না।

আদম সন্তান ভাবতে লাগলো, দ্বীপের এসব প্রাণী কতোই না সরল সহজ। এরা আমার মতো কোন কাজই জানে না। নতুন কোন কাজই করতে পারে না। হরিণটার কথাই ধরা যাক। যদি আমি না থাকতাম তাহলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তার যে কী অবস্থা হতো তা কে জানে?

পরদিন হঠাৎ তার মনে পড়লো কুকুর ও কবুতরের কথা। তার ইচ্ছা হলো সে-ও কবুতর ধরবে। আমি কবুতর ধরতে পারবো ঠিকই কিন্তু হরিণী তা পারবে না। কুকুর তা জানে। দেখা যাক ধরতে পারি কিনা। সে ঝোপ-ঝাড়ে পড়ে থাকা কিছু শস্যদানা জমা করে তা কবুতরদের সামনে ছড়িয়ে দিতেই কবুতররা তার হাতের মুঠোয় এসে গেলো। সে একটিকে ধরে এর মাথাটা ছিঁড়ে ফেললো। হায় বেচারা কবুতর! মানব শিশু দেখলো কবুতরের রক্ত তারই রক্তের মতো। তার হাত পায়ে কখনো আঘাত লাগলে এমনি রক্ত বের হয়। তাহলে কবুতরের নিশ্চয়ই অনেক ব্যথা ও কষ্ট হয়েছে! কবুতরও তারই মতো একটা প্রাণী। তার কণ্ঠ কতই না সুন্দর, কতোই না সদয়।

মানব সন্তান আসলে কুকুরের কাজই অনুকরণ করতে চেয়েছিল। কবুতরটির শরীর প্রথম গরম ছিল পরে ঠান্ডা হয়ে গেছে। কবুতরের পাখা ও পালক খাওয়া গেলো না। কিন্তু গোশত খেতে গিয়ে দেখলো তা খুব শক্ত, দাঁত দিয়ে ছেঁড়া যায় না। অনেকক্ষণ চিবিয়ে কিছু খেলো এবং বাকী অংশটা হরিণের মুখের কাছে নিয়ে ধরলো। কবুতর তখন পালিয়ে যেতে পারলো না। বুঝা গেলো প্রাণীদের শরীর যখন ঠিক থাকে, গরম থাকে তখনই পালাতে পারে, আওয়াজ করতে পারে। তাই তাকেও চেষ্টা করতে হবে যাতে সে ও হরিণ দু'জনেই সুস্থ্য ও সবল থাকতে পারে।" যাক, হরিণী কিন্তু কবুতরের গোশত খেলো না।

আদম সন্তান আবারো কবুতর হাতে নিলো। কবুতরের দেহটির গঠন কৌশল খুটিয়ে খুটিয়ে দেখার সময়ই বাইরে থেকে কান ফাটা কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলো। দৌড়ে গুহার বাইরে এলো ব্যাপার কী দেখার জন্যে। বহু জন্তু-জানোয়ার ভয়ে পালে পালে দৌড়ে পালাচ্ছে। গুহার সামনে দিয়েই ওরা যাচ্ছিলো। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলো ঝোপ-ঝাড় থেকে কালো ধূয়া বেরুচ্ছে।



www.pathagar.com

আসলে বজ্রপাতের ফলে বনে আগুন ধরে যায়। তবে সে এর আগে কখনো ধূয়া ও আগুন দেখেনি। ধূয়া ও আগুনের লেলিহান বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো। তার কাছে খুব ভাল লাগছিল। সে দৌড়ে আগুনের কাছে যেতেই টের পেলো ভীষণ গরম। একী আজব জিনিস! বাতাসে আগুন ছড়িয়ে পড়লো গুহার কাছে। সেখানে ছিটিয়ে থাকা শুকনো খড়কুটা ও আগাছায় আগুন ধরে গেলো। আদম সন্তান জ্বলন্ত আগাছায় হাত দিলে তার হাত পুড়ে গেলো। সে মনে করলো সূর্য হয়তো নিচে নেমে এসেছে। কিন্তু ভাল করে আকাশে তাকাতেই মেঘের ফাঁকে সূর্যকে দেখতে পেলো। সূর্য তার অবস্থানেই আছে। সে তখন মনে করলো আগুনও বুঝি বাচ্চা সূর্য! তার পায়ের কাছেই একটি শুকনো ডালে আগুন ধরে যায়। সে ডালের অপর প্রান্তে এক হাতে ধরে দেখলো তা ঠান্ডা। সে যখন আগুনের রং তামাশা দেখছিল তখন তার অপর হাতে ধরা কবুতরের পাখায় আগুন ধরে গেলো। আগুনের শিখায় তার হাতও উত্তপ্ত হলো। সে কবুতরটি ছুঁড়ে মারলো। এরপর আবারো নিমগ্ন হলো জ্বলন্ত ডালটি নিয়ে। ডালের উষ্ণতাকে তার পছন্দ হচ্ছিল। সে ডালটি নিয়ে ঢুকলো গুহার ভেতর হরিণীকে দেখানোর জন্য। আগুনে গুহার অন্ধকার দূর হয়ে গেলো। সে নিশ্চিত হলো যে নিশ্চয় এটি সূর্যের বাচ্চা। সূর্যের মতোই উজ্জ্বলও করে আবার গরমও করে!

আগুনের প্রতি তার উৎসাহ থাকলেও হরিণ কিন্তু ফিরেও তাকায়নি আগুনের দিকে। সে আগুন নিয়ে এলো হরিণের মুখের কাছে। হরিণের মুখের লম্বা লম্বা চুলগুলো পুড়ে গেলো। হরিণ উঠে দাঁড়ালো এবং 'পোফ্ পোফ্' শব্দ করলো। হরিণের নাকের প্রশ্বাসে আগুন নিভে গেলো এবং ধূয়া বড় হয়ে উঠলো। মানব সন্তান ভাবলো ঃ "আহ্! আগুন যদি না নিভতো তাহলে গুহাটি উজ্জ্বল-আলোকিত থেকে যেতো। কিন্তু নিভে গেলো কেনো?"

সে আবারো বাইরে এলো। দেখলো খড়কুটা ও আগাছা তেমনি পুড়ছে। তখন সে বুঝলো, এরা যখন বেশী থাকে তখন নিভে না কিন্তু কম হলে নিভে যায়। যেমন করে শাকসবজী কম থাকলে শেষ হয়ে যায় কিন্তু মাঠ-প্রান্তর শেষ হয় না। সব সময় রয়েছে।

সে আবারো এগিয়ে গেলো কোন আধ পোড়া ডাল বা কাঠ পাওয়া যায় কীনা। ঠিক এমন সময় তাঁর নাকে এলো কাবাবের ঘ্রাণ। দেখলো কবুতর তখনো পুড়ছে। সেখান



www.pathagar.com

থেকেই এ ঘ্রাণ আসছে। সে তখন জ্বলে যাওয়া আগাছার মাঝ থেকে কবুতরটি উঠিয়ে আনলো। গরমে তার হাত পুড়ে গেলো। তাড়াতাড়ি ফেলে দিলো নিচে। কিন্তু কবুতরের ঘ্রাণ তাকে আকর্ষণ করছিল। কিছুক্ষণ পর সে কবুতরের গায়ে হাত দিয়ে দেখলো ঠান্ডা হয়েছে এবং বেশ নরম। মুখে দিয়ে চিবুতেই খুশীতে আটখানা হয়ে গেলো। এ জিনিস সে আর কখনো খায়নি। এতো দিন সে যা কিছু খেয়েছে কবুতরের গোশত তার কাছে সবচে মজা লাগলো। সে বুঝলো আগুনই একে এতো মজাদার করেছে।

সে আগুন কুড়িয়ে নেয়ার কথা ভুলে গেলো এবং খুশীতে কবুতরের গোশত নিয়ে দৌড়ে গেলো হরিণের কাছে এবং কাবাব হওয়া কবুতরের গোশতের একটি টুকরো ছিঁড়ে তাকে দিলো। বুঝাতে চাইলো, এখন অনেক মজা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে বুঝাবে! তখন সে আগুনের মতো "মট মট ও সা সা" আওয়াজ করলো। অর্থাৎ কবুতর এখন ভাল করে রান্না হয়েছে। কিন্তু হরিণ তখনো খেলো না। তখন আদম সন্তান বুঝলো ঃ "এ হরিণের মাথায় কিছুই নেই। সে শুধু ঘাস ও পানি খাওয়া ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।"

সে আবারো যখন বাইরে এলো তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এবং সকল আগুন একে একে নিভে যাচ্ছে। আগুন এবং উত্তপ্ত মাটিতে যখন বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিলো তখন 'ছ্যাৎ ছ্যাৎ' আওয়াজ হচ্ছিল। আদম সন্তান এ আওয়াজ নকল করার চেষ্টা করলো। ছ্যাৎ ছ্যাৎ! অর্থাৎ আগুন বৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। আগুন একেবারে নিভে গেলো। বহু দিন পর্যন্ত আর আগুন দেখা গেলো না। সেও আর কবুতর ধরে কাবাব বানাতে পারলো না। সে বুঝতে পারছিল না আগুন কোথায় থাকে? কেনো এসেছিলো? কবে আবার সূর্য শিশু আসবে এবং সে খেলা করতে পারবে?

ক'দিন পর হরিণের অবস্থা ভাল হলো। পুনরায় দু'জন এক সাথে মাঠে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো শুরু করলো। এবার এরা বহু নতুন নতুন তাজা খাবার খুঁজে পেলো। কিন্তু হরিণ তার ঘাস ও লতাপাতা ছাড়া আর কিছুই খেলো না। গোশত, ফল কিছুই না।

একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটলো। জঙ্গলের কিনারায় গিয়ে ওরা যখন ঘোরাঘুরি করছিল তখন হঠাৎ এক ক্ষুধার্ত নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো হরিণের ঘাড়ে। হরিণের এক পা


www.pathagar.com

জখম হলে সে মাটিতে পড়ে গেলো। এরপর নেকড়ে একে খাওয়া শুরু করলো। হরিণের চিৎকার ও নেকড়ের দাপাদাপি দেখে আদম সন্তান ভয় পেয়ে গেলো এবং দ্রুতগতিতে পালিয়ে এলো গুহায়। সে বুঝলো যে, হরিণ আর নেই। হরিণ আর ঘরে ফিরে আসবে না যেমন করে ওই কবুতরগুলো ঘরে ফিরে যায়নি।

আদম সন্তান তখন জোরে জোরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। তার কান্না ছিল বিষাদপূর্ণ, হরিণের প্রতি তার ভালবাসা ও বন্ধুত্ব মিশ্রিত। সে যে এখন একা! তার আর কেউ রইলো না। যদিও সে এখন অনেক কিছুই জানে, অনেক কিছুই শিখেছে, জীবনের অর্থ বুঝেছে এবং দ্বীপে পশুপাখির কোন অভাব নেই তথাপি তার প্রিয়তম বন্ধু, সহচর, সমভাষী, মা হরিণ আর নেই। একাকীত্বের বিষাদ ও তিক্ততা তাকে ছেয়ে ফেললো। তার জীবনের এটি ছিল মস্তবড় দুঃখ ও বিরহ বেদনা। এ ঘটনার পর থেকে তার চিন্তা-ভাবনা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগলো। সে তার বুদ্ধিমত্তাকে আরো সুচারুরূপে কাজে লাগাতে শুরু করলো।

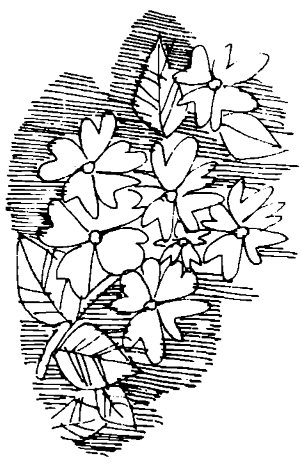


www.pathagar.com

# আদম সন্তান তার চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগায়

এখন তার করণীয় কী?

মানব সন্তান গুহায় বসে ভাবছে! কোন কোন পশু খুবই খারাপ। আজ নেকড়ে এসে হরিণকে খেয়ে ফেললো। সেদিনও কুকুর এসেছিল হরিণকে খেতে। হরিণের যদি শিং না থাকতো আমাকেও নিশ্চয় খেয়ে ফেলতো। সুতরাং বাঁচতে হলে সেই শিং দরকার।

এই ভেবে সে গুহার বাইরে এলো এবং খুব সতর্কতার সাথে জঙ্গলের পাশে পড়ে থাকা হরিণীর মাথাটির কাছে গেলো এবং সেটি নিয়ে এলো গুহার ভেতর। সে হরিণীকে ডাকলো, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ এলো না। তার ডাক হরিণীর কানে ঢুকলো না। সে নিজেও এ বিষয়টি জানতো। অনেক পশুপাখির নিহত হওয়াকে সে দেখেছে। হাই বিন ইয়াকজান এরপর হরিণের কেল্লাটি পাশে রেখে দুখে-শোকে খুব ভাবতে লাগলো।

রাতে হাওয়া বেশ ঠান্ডা হয়ে এলো। এখন আর হরিণ নেই যে তার বগল দাবায় চেপে নিজেকে গরম রাখবে। এখন নিজেকে গরম রাখার জন্যে কী করা প্রয়োজন? সে দেখেছে যে, যখন শুকনো খড়কুটার উপর শুয়েছে তখন তার শরীর যেখানে খড়কুটার সাথে চাপা আছে তা গরম থাকে। সে বুঝতে পারলো, এ উষ্ণতা তার শরীরেরই যা খড়কুটোকে উষ্ণ করে তোলে। এই ভেবে সে কিছু খরকূটো বিছিয়ে তার উপর শুলো এবং গায়ের উপর অনেক খড়কুটো ছড়িয়ে দিলো। শ্বাস নেয়ার জন্যে মাথা বাইরে রাখলো। ব্যস, ঠান্ডা সমস্যা মিটে গেলো। কিন্তু সে রাতে তার ঘুম হয়নি। একাকী জীবনের চিন্তা তাকে নিস্তার দিলো না। সে তার চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগানো শুরু করলো। অনেক কিছুই সে ভাবলো। যেমন ঃ "আত্মরক্ষার জন্যে হরিণের শিং খুব ভাল জিনিস। রাতের বেলায় গা ঢেকে রাখতে হয়। দ্বীপের কোন কোন প্রাণী ভাল ও ক্ষতি করে না। এরা হচ্ছে, হরিণ, কবুতর, ছাগল, ভেড়া, কাছিম, খরগোশ, মোরগ ইত্যাদি। আবার কোন কোন প্রাণী খুব খারাপ। যথা ঃ কুকুর ও



www.pathagar.com

নেকড়ে। ভাল প্রাণীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে এবং খারাপ প্রাণীদের থেকে দূরে থাকতে হবে। যদি ওরা হামলা করে তাহলে হরিণের শিং দিয়ে ওদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। আগুন কম হলে তাড়াতাড়ি নিভে যায়। এ জন্যে বেশী হতে হবে এবং বৃষ্টির বাইরে থাকতে হবে। তাহলেই নিভবে না। আগুন থাকলে গুহাটাকে আলোকিত করতো, গোশত খুব মজাদার হতো। কিন্তু আগুন কোথায় থাকে? কয়েকটা কবুতর এনে গুহায় রাখবো। নাহ্! লাভ নেই, পরদিন ভোরে পালাবে। হরিণই ভাল ছিলো। চলে যেতো না। গেলেও ফিরে আসতো।...."

ভোর বেলায় আদম সন্তান হরিণের শিং হাতে নিয়ে বাইরে এলো। সূর্য উপরে উঠে গেছে। সে প্রথমেই গেলো পোড়া ঝোপ-ঝাড়ে। না, আগুনের কোন খবর নেই। কাঠ কয়লা ও ছাইগুলো খুবই ঠান্ডা হয়ে পড়ে আছে। সে চিন্তা করলো, ঠান্ডা জিনিসটা ভাল নয়। আলো ও তাপ ভালো জিনিস। গুহাটা বেশ অন্ধকার ও ঠান্ডা। তার হাত বুকে ঠেকিয়ে দেখলো বেশ গরম, ঠান্ডা নয়। বললো, এটাই খোঁজ করছি। রোদ ও আগুন বেশ গরম। আমার শরীরেও সেই উষ্ণতার কিছু রয়েছে। এটা শরীরেরই। শরীর পাথর ও কাঠের মতো নয় যে, রোদে গরম হবে আবার ছায়ায় ঠান্ডা হয়ে যাবে। তবে আগুন সবচে বেশী গরম ও উজ্জ্বল। এতো গরম যে, কাছে হাত নেয়া যায় না।

মানব সন্তানের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা এখন আগুনকে ঘিরে। কোথায় পাবে এ আগুন? বহুদিন পর্যন্ত এ ভেদ উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তবে একদিন আদম সন্তানের কাছে এ রহস্যও প্রকাশিত হয়ে গেলো।

সেদিন সে একটি টিলার উপর গিয়েছিল। সে সময় টিলার নিচে ও প্রান্তরে অনেক কবুতর, শালিক ও চড়ুই জমা হয়। হঠাৎ একটি পাথর উপর থেকে ছুটে গড়িয়ে পড়লো নিচে। পাখিরা ভয় পেয়ে উড়াউড়ি করলো। এদের একটি মারা গেলো পাথরের নিচে পড়ে। পাথর গড়িয়ে গেলে পাখির পাখা ঝাপটানো সে দেখতে পেলো। সে ভাবলো ঃ "তাহলে পাথর দিয়ে পাখি মারা যায়। ওরাও তা জানে। এ জন্যেই পাথরকে ভয় পায়।"

আদম সন্তান বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখলো। যেখানেই পাখিরা জমতো সেখানেই সে পাথর মারলো। পাখিরা পালিয়ে যেতো। সে পাখি শিকার করতে চাইলো। হাতের কাছে ছোট পাথর টুকরো না থাকায় একটি বড় পাথর নিয়ে চেষ্টা করলো।



www.pathagar.com

না, ঢিল ছুঁড়তে পারলো না। পাথর তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে কয়েক টুকরা হলো। এভাবে সে শিখে ফেললো বড় পাথরকে কিভাবে টুকরা করতে হয়। সে কয়েকবার এ কাজ করলো। সে তখন দেখতে পেলো যে, এক পাথরের সাথে আরেক পাথরের আঘাত লাগলে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। যেমন বৃষ্টির সময় আকাশে আগুনের মতো দেখা যায়। স্ফূলিঙ্গ দেখতে কতো সুন্দর! বেশ উজ্জ্বল। ঠিক আগুনেরই মতো। তবে গরম নয়। সে জানতো যে, আগুন অন্ধকারে বেশ সুন্দর।

সে দু'টুকরো পাথর নিয়ে এলো গুহায়। গুহার অন্ধকারে পরীক্ষা চালালো আলোর সৃষ্টি করতে। একটির উপর আরেকটি মারতে লাগলো। স্ফুলিঙ্গ তৈরী হয়ে গুহাটি উজ্জ্বল করে তুলছিল। কিন্তু এতে গুহা গরম হচ্ছিল না। এভাবে কয়েকবার পাথরে পাথর মারার পর হঠাৎ তার হাতে পাথরের একটি স্থান গরম মনে হলো। ভাবলো ঃ "আজব ব্যাপারতো! ঠান্ডা পাথরও তাহলে গরম হয়! তাহলে কী এই স্ফূলিঙ্গই ওই আগুন যা ঝোপ-ঝাড়কে উজ্জ্বল করেছিল ও জ্বালিয়ে দিয়েছিল? কিন্তু তাতো অনেক বেশী ছিল। এ যে অনেক কম, এতে হাত পুড়ে না। পাথর যখন গরম হচ্ছে তখন বেশী করে পিটিয়ে দেখি। হয়তো আরো গরম হবে, বেশী গরম হলে আগুন জ্বলবে।"

মাটির উপর ভাল দেখে একটি জায়গায় পাথরের একটি টুকরো রাখলো এবং আরেকটি হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে সজোরে পিটাতে লাগলো। হাতের পাথরের পিটুনীতে নিচের পাথর মাটির ভেতর ঢুকে যাচ্ছিল। পাথরটি উঠিয়ে একে একটি সমতল কাঠের উপর রাখলো। তারপর আবার আঘাত আর আঘাত। উভয় পাথরই বেশ গরম হয়ে উঠলো, কিন্তু আগুন জ্বলেনি। শুধু একবার করে স্ফূলিঙ্গ জ্বলে উঠে সাথে সাথেই নিভে যেতো। আদম সন্তানও দমে যাবার নয়। ভাবলো, বেশী করে মারলে যখন গরম হয়ে উঠে তখন আরো বেশী মারবো, তাতে আরো গরম হবে এবং যা অনেক বেশী গরম হবে তা-ই আমি চাই। সুতরাং মারো, 'দ..ম্ব, দ...ম্ব, দ....ম্ব'।

যে কাঠের উপর পাথর রাখা ছিল সে কাঠ ছিল পুরনো শুকনো কাঠ। এতে কোন সারসত্তা ছিল না। পাথর আঘাতে আঘাতে কাঠের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। হঠাৎ সামান্য ধূয়া দেখা দিলো। আদম সন্তান বুঝলো সে ঠিক পথই বের করেছে। আগুন খোঁজার আনন্দে তাই ক্লান্তি কী জিনিস বুঝতেই পারছিল না। শুধু আঘাত আর আঘাত হেনে চললো। একের পর এক উজ্জ্বল লাল নীলাভ স্ফূলিঙ্গ ফুটতে লাগলো।



www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত ফল লাভ করলো। কাঠের ক্ষয়ে যাওয়া শুকনো নরম অংশ পাথরের তাপে নিজেও উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। আগুনের স্ফুলিঙ্গ ওকে জ্বলতে সাহায্য করলো। প্রথমে ধূয়ার সৃষ্টি হয়ে এরপর লাল আগুন কাঠের গায়ে জ্বলে উঠলো।

আদম সন্তান আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়লো। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। হাতের পাথর ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। খুশীতে নিজের চারপাশেই ছুটতে লাগলো। এরপর উল্লাসে ফরিয়াদ শুরু করলো। তার আনন্দ আর ধরে না। সে হরিণ, কুকুর, কবুতর ও অন্যান্য পশুপাখির আওয়াজ যা জানতো সবই উচ্চারণ করতে লাগলো। শেষে আনন্দে কেঁদেই ফেললো। আহ্! আনন্দের কান্না কতইনা মজা! সে নিজেই কী না আগুন তৈরী করলো। এখন থেকে যখন মন চাইবে তখনই সে আগুন তৈরী করতে পারবে, সূর্যের বাচ্চাকে জন্ম দিতে পারবে! সে আরো বুঝলো যে, পাথর গরম হয় ঠিকই তবে পুড়ে না। কিন্তু গাছের শুকনো নরম কাঠ জ্বলে। সে জ্বলন্ত কাঠটিকে উঠিয়ে মুখের কাছে আনলো। কাঠ থেকে ধূয়া বেরুচ্ছিল অনেক। ধূয়া তার চোখে পানি এনে দিলো। কিন্তু তার শ্বাস-প্রশ্বাস আগুনে



www.pathagar.com

লাগতেই তা আরো লাল হয়ে উঠলো। তখন সে ওতে ফুঁ দেয়া শিখলো। যত বেশী ফুঁ দিলো ততই আগুন লাল হলো।

এমন সময় বাইরে থেকে সাড়া শব্দ কানে এলো। হাতের জ্বলন্ত কাঠ নিয়েই সে এলো গুহার বাইরে। না, কিছুই নেই। তবে জোরে বাতাস বইছিলো। বাতাস আগুনে লাগতেই আগুন আরো বেশী লাল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হঠাৎ কাঠে আগুনের শিখা জ্বলে উঠলো এবং ধূয়াও কমে এলো। সে বুঝতে পারলো বাতাসও আগুনকে সাহায্য করে। জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে এবার সে ঢুকলো গুহায়। সারা গুহা আলোতে ভরে গেলো। সে কাঠটি মাটিতে রাখলো। আগুন শুকনো খড়কুটায় ছড়িয়ে পড়লো। ধূয়া তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিলো।

তার মনে পড়লো, টিলার উপর থেকে পাথর ছুঁড়ে মারার সময় একটি পাখি মারা গিয়েছিল। দৌড়ে গিয়ে পাখিটা নিয়ে এলো এবং আগুনে ছুঁড়ে মারলো। সে আগেই জেনেছিল যে, কাবাবের ঘ্রাণ যখন ছড়াবে তখনই গোশত খাওয়া যাবে। সে এটাও জানতো যে, কোন কাঠের মাথা যখন জ্বলতে থাকে তখন এর অন্য মাথা ঠান্ডা থাকে। সে তখন একটি আধ পোড়া ডাল হাতে নিয়ে কাবাব হওয়া পাখিটাকে আগুন থেকে বের করে আনলো। ব্যস, আদম সন্তান এভাবে খাবার তৈরী শিখে ফেললো। পাথরের আঘাতে আগুন জ্বালানো, পাথর ছুঁড়ে পাখি মারা এবং আরো অনেক কিছু সে জেনে গেছে।

দেখতে দেখতে সমস্ত খড়কুটা ও ঘাস আগাছা জ্বলে ছাই হয়ে গেলো। গুহা ভরে গেলো ধূয়ায়। আগুনে আর বড় বড় শিখা ছিল না। সে এখন বুঝে নিয়েছে যে, খড়কুটা, ঘাস-আগাছা এবং কাঠ পুড়ে কয়লা ও ছাইয়ে পরিণত হয়। সে অভিজ্ঞতায় তা দেখেছে। সে এও বুঝেছে যে, খড়কুটা ও কাঠ যত বেশী দেয়া যাবে আগুনও তত বেশী ছড়বে ও বড় হবে। তবে জ্বালানী শুকনো না হলে জ্বলবে না। কম হলে কম কম জ্বলবে। সে ক্রমশঃ আগুনের সব ধর্ম-বৈশিষ্ট্য শিখে ফেললো। সে দ্রুত বের হয়ে গেলো গুহার বাইরে। অনেক কাঠ সংগ্রহ করে আনলো এবং আগুন থেকে দূরে রাখলো। এরপর একটি একটি দু'টি দু'টি করে শুকনো কাঠ আগুনের উপর রাখলো।

তাহলে এভাবে আগুন ধরে রাখা যায়। যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে ফের একই কায়দায় জ্বালানোও যাবে। সে তার এ আবিষ্কারে দারুণ খুশী হলো। ঠিক এমন সময়



www.pathagar.com

ঘেউ ঘেউ শব্দ কানে এলো। কাবারের ঘ্রাণই কুকুরকে সেখানে নিয়ে এলো।

আদম সন্তান কুকুর তাড়ানোর জন্য হরিণের শিংটা খোঁজ করতে গিয়ে দেখলো তা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে একটা আধ পোড়া ডাল ছিল যা হরিণের শিংয়েরই মতো। সে ওটাই হাতে নিল এবং গুহা মুখে উপস্থিত হলো। ডালের মাথা দিয়ে তখনো ধূয়া বেরুচ্ছিল। কুকুর তা দেখেই পালালো। একটু দূরে গিয়ে বসলো এবং আবারো ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

আদম সন্তানও কুকুরের ডাক নকল করলো এবং আধ পোড়া ডাল দিয়ে কুকুরের প্রতি হামলা চালালো। কুকুর এবারও আরো কিছু দূরে গিয়ে বসলো, পালালো না। এরপর তার মনে পড়লো সে পাথর ছুঁড়তে জানে। এবার পাথর নিয়ে মারতেই পাথর গিয়ে লাগলো কুকুরের পাজরে। কুকুর এবার তার স্বরে ঘেউ ঘেউ করে সেখান থেকে পালালো।

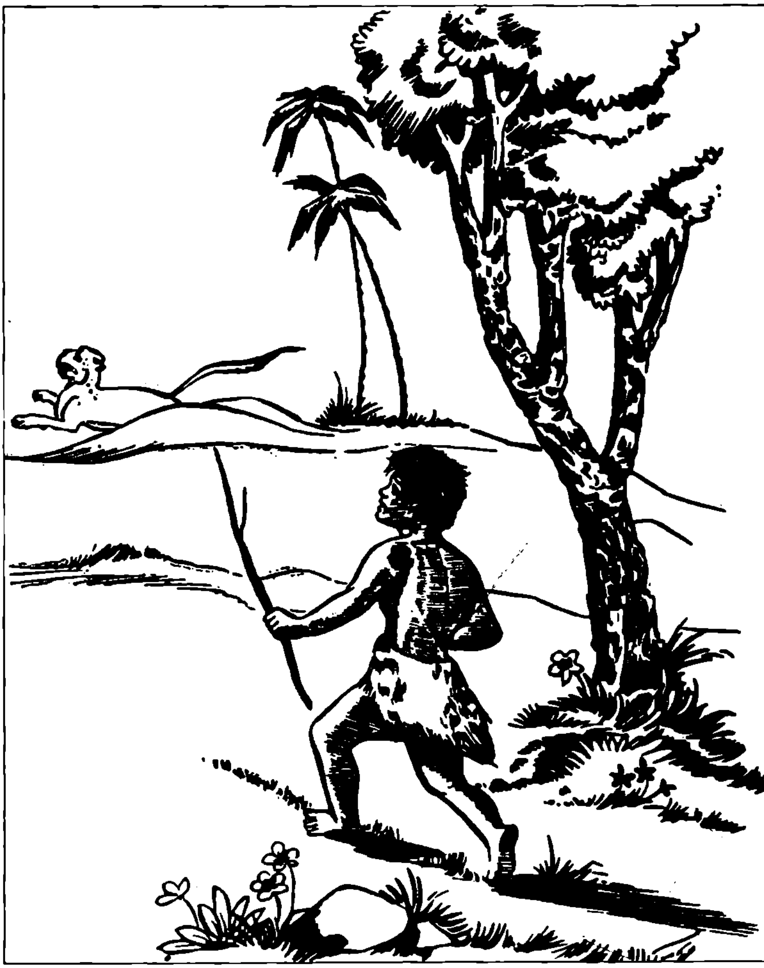

তাহলে বুঝা গেলো হরিণের শিং না থাকলেও গাছের ডাল দিয়ে শত্রুকে তাড়ানো যায়। পাথর ছুঁড়েও দূর করা সম্ভব। এ ভেবে তার মনে সান্ত্বনা ও অভয় এলো। তবে আরেকটি নয়া চিন্তা এলো তার মাথায়।

কুকুর যদি ঘেউ ঘেউ আওয়াজ না করে আসে এবং আমি যখন ঘুমিয়ে থাকবো তখন যদি গুহায়



www.pathagar.com

ঢুকে পড়ে তখন কী করবো? এ ধারণা মাথায় ঢুকতেই আদম সন্তান ভয় পেয়ে গেলো। কিন্তু শিগগিরই এর উপায়ও খুঁজে পেলো। আসলে চিন্তা-ভাবনা খুবই ভালো কাজ। চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ যে কোন সমস্যারই সুরাহা করতে পারে এবং যে কোন ইচ্ছাকেই মেটাতে সক্ষম হয়। আদম সন্তান চিন্তা করলো ঃ "কুকুর আমারই মতো প্রাণী। সে তো গুহার ভেতর থেকে উদয় হবে না, ছাদ ফুড়েও আসবে না, দেয়াল ভেদ করেও আসতে পারবে না, বরং গুহার মুখ দিয়েই কেবল ঢুকতে পারবে। যদি গুহার মুখে পাথর সাজিয়ে উঁচু করে দেই তাহলে নিশ্চয়ই ঢুকতে পারবে না। যদি আসতে চায় তাহলে পাথর সরিয়ে আসতে হবে। পাথরের আওয়াজে আমারও ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তখন আমি তাকে হামলা করবো ও তাড়িয়ে দেবো।"

এরপর নিজে নিজেই হেসে ফেললো। ভাবলো, "কুকুরের তো হাত ও মুঠো নেই যে পাথর সরাতে পারবে।" নিজের হাসির আওয়াজ তার কানে এলো ঃ "হা হা হা!" বেশ মজাই পেলো এ আওয়াজে।

যেই ভাবা সেই কাজ। টিলার কাছে গিয়ে বড় বড় পাথর বেছে একে একে নিয়ে এলো গুহা মুখে এবং একটির উপর একটি থরে থরে সাজালো। এভাবে গুহা মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। তখন সে দেখলো সে নিজেও গুহায় ঢুকতে পারবে না। আবারো হেসে উঠলো। প্রতিবারই যখন তার ভুল হতো তখনই তার দারুণ হাসি পেতো। যাক, এরপর পুনরায় পাথরগুলো নামিয়ে গুহার ভেতর নিয়ে গেলো এবং ভেতর থেকে গুহার মুখ বন্ধ করলো। সে রাতে তার ঘরটি বেশ গরম ও আরামদায়ক ছিল। এ ছাড়াও ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত।

এসব কাজ করে তার মনে বেশ শান্তি ও নিরাপত্তা এসেছে। আগুন জ্বালানো, গোশত পাকানো ও গুহার দরজা বন্ধ করা সে নতুন শিখলো। কিন্তু এখনো অনেক সমস্যা রয়েছে। "আগুন দিয়ে না হয় গুহাকে গরম করলো এবং রাতে খড়কুটা এনে সে সবের উপর ঘুমুলো। বেশ ভাল কথা। কিন্তু শীতের দিনে মাঠে ময়দানে শরীর যে বরফ হয়ে আসে। তার কী উপায়।

সে ভাবলো তার শরীরেও যদি পশুপাখির মতো পশম ও পালক থাকতো তাহলে তার শরীর ঠান্ডা হয়ে আসতো না যেমন রাতে গুহায় খড়কুটার মাঝে তার দেহ আর ঠান্ডা হয় না। তাহলে কী করা যায়? অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এরও উপায় খুঁজে পেলো। "অবশ্যই কোন একটি পশুর চামড়া ছিলে তার মাঝে ঢুকে পড়বো।" কিন্তু



www.pathagar.com

এ কাজও ছিলো বেশ শক্ত। একটি বড় পশু কীভাবে সে ধরবে ও চামড়া কীভাবে ছাড়াবে? যত চিন্তাই করুক না কেনো কিছুতেই সে সমাধান খুঁজে পেল না।

বেশ কিছু দিন গেলো। রোদের দিনগুলোতে দ্বীপে সে ঘুরে বেড়াতো আর প্রতিদিন নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করতো। একদিন সে শাক-সবজী সংগ্রহ করছিল। পেয়ে গেলো একটি শালগমের গাছ। শালগমের পাতা ধরে টানতেই বেরিয়ে এলো মাটির ভেতর থেকে শালগম। সে শালগম খেয়ে দেখলো তা পাতার চেয়েও অনেক মজা। ভাবলো ঃ "কতো ভাল জিনিসই না মাটির নিচে রয়েছে!"

সেদিন থেকে সে চেষ্টা চালাতো প্রতিটি শাক-সবজীকে মূলসহ উপড়িয়ে ফেলতে। কোন কোন শাক-শবজীর মূল তেমন ভাল ছিল না। যেমন সরু, তেমনি শক্ত ও বে-মজা। তবে ধীরে ধীরে শালগম, বীট, গোলআলু, গাজর, মূলা, কপি ইত্যাদির সন্ধান পেলো। তবে ওগুলো শালগমের চেয়ে বেশ শক্ত। কিন্তু আদম সন্তান সবগুলোকেই আগুনে দিয়ে গোশতের মতোই আধ পোড়া কাবাব করলো। দেখলো এতে বেশ নরম ও অনেক মজা হয়। সে সব কিছুকেই আগুনে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে পোড়ালে কেমন লাগে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সে অনেক নয়া নয়া বিষয় আবিষ্কার করলো এবং শিখে নিলো।

দিন দিন তার খাদ্য তালিকা দীর্ঘ হতে লাগলো। মাটির নিচের বহু ফলমূল তরকারীর সন্ধান সে পেয়ে গেলো। তবে পাখি ও মোরগের গোশত তার কাছে সবচে মজাদার লাগতো। সে যেখানেই পাখি দেখতো সেখানেই ছুটে যেতো। এভাবে একদিন পাখির পিছু নিয়ে পৌঁছে গেলো গমের জমিতে। সে গমের সবুজ শীষ মুখে দিয়ে চিবিয়ে খেলো। বেশ ভালই লাগলো। সে শুকনো গমের দানাগুলো চিবিয়ে খেতে পারলো না। বেশ কষ্ট হয়। তবে ওগুলো পাখিদের জন্য জমা করলো। একবার আগুনের উপর গম ছুড়ে দিতেই খৈ-এর মতো ভাজা হলো। তা খেয়ে বেশ মজা পেলো। শুকনো গম চিবিয়ে খেলে তার পেটে ব্যথা করে। এ বিষয়টি সে কয়েকদিন টের পেয়েছিল। তাই এরপর থেকে আগুনে পুড়িয়েই খাওয়া শুরু করলো। কাঁচা ও অপুষ্ট গমও পেট খারাপ করে। সে এসব অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশঃ স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সজাগ সচেতন হতে শুরু করলো। এছাড়া গাছগাছালীতে উঠে আনার, আঙ্গুর, আপেল, কলা, আনারস, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের সাথে পরিচিত হলো এবং যখন যা খুশী তাই পরিমাণ মতো খেয়ে নিতো। তার জন্যে কতো কিছু এ জঙ্গলে রয়েছে! তার কাছে মনে হতো এ সুন্দর জগৎটা কতোই না বড় ও ভাল। সে চিন্তা করতে



www.pathagar.com

লাগলো দুনিয়াতে সে যা কিছু এ যাবৎ জেনেছে তার চেয়েও আরো বহু কিছু বাকী রয়ে গেছে। প্রতিদিন সে নতুন নতুন বিষয় ও নতুন নতুন খাদ্য দ্রব্য আবিষ্কার করতে লাগলো। তবে খাদ্য দ্রব্যের ভেতর সে পাখ-পাখালীর গোশতের কাবাব ও গম পোড়া খৈ সবচে বেশী পছন্দ করতো।

এমতাবস্থায় সে একদিন এক নতুন বিষয় আবিষ্কার করে ফেললো এবং তা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝতে সক্ষম হলো। সে পিঁয়াজের গাছ ধরে টান দিতেই পিঁয়াজ উঠে এলো। ধূলাবালি পরিষ্কার করে পিঁয়াজ মুখে দিয়ে চিবালো। উৎকট গন্ধ তার নাকে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। পিঁয়াজ নাকের কাছে নিয়ে শুঁকলে তার ঝাঁঝ এসে চোখে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে পানি বেরিয়ে এলো। সে চিন্তা করলো সে কাঁদছে। কিন্তু সে কাঁদছে কেনো? পিঁয়াজের রসে ভেজা হাত দিয়ে চোখের পানি মুছতে গেলে অবস্থা আরো খারাপ হলো। তখন সে বুঝলো যে, চোখের পানি আসলে পিঁয়াজের কারণে। তাহলে পিঁয়াজের গন্ধই চোখে পানি নিয়ে আসে যেমন করে কাঁচা আঙ্গুর মুখে দিলে মুখে পানি উঠে, মরিচ মুখে দিলে জ্বালাপোড়া করে ও খোরমা খেলে তৃষ্ণা পায়। এতে বুঝা গেলো প্রতিটি দ্রব্যের আলাদা আলাদা গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার মনে পড়লো সেদিন শুকনো গম চিবিয়ে খেয়েছিল বলে তার পেট ব্যথা করে, আরেকদিন খালপাড়ের ব্যাঙের ছাতা খাওয়ায় তার মাথা ও শরীরে ব্যথা শুরু হয় এবং এবং পরে সে বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। এরপর বমি হলে বমির সাথে ওসব খাদ্য বেরিয়ে পড়ে। তখন ধীরে ধীরে তার অবস্থা ভাল হয়ে উঠে।

আদম সন্তান ক্রমশঃ খাদ্য সামগ্রীর গুণ বৈশিষ্ট্য এবং ব্যথা বেদনা ও অস্বস্থির কারণাদি শিক্ষা করতে লাগলো। এসব ব্যাপারে সে অনেক চিন্তা করতে থাকলো। এ জন্যে পরবর্তীকালে সে নয়া ও অজানা কোন কিছু খাওয়ার আগে সতর্ক হতো। প্রথমতঃ সামান্য কিছু মুখে দিয়ে দেখতো। এরপর কোন কিছু না হলে আরো বেশী খেতো। এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ছাড়া তার উপায়ও ছিল না। তার কেউ ছিল না যে, তাকে শেখাবে, বলে দেবে।

তার গুহার বাইরে নিকটেই ছিল একটি সমতল ভূমি। ওতে কয়েকটি ছোট বড় গাছ ছিল। দিনের বেলায় পাখিরা ওখানে এসে বসতো। এ জমিটি ছিল আদম সন্তানের শিকার ধরার জায়গা। গম, ধান, যব, কাউন, ফুলের দানা যা কিছু সে পেতো সেগুলো ছড়িয়ে দিতো। সে জানতো ওসব দানা খাওয়ার জন্যে পাখিরা নেমে আসবে নিচে। সে পাখিদের এসব খাবার তার গুহার ভেতরেও এনে জমা করতো।


www.pathagar.com

প্রয়োজন মতো সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতো ওই জমিনে। পাখিরা এসে ওখানে জমা হলে সে পাথর ছুঁড়ে ওদের শিকার করতো। অবশ্য এভাবে শিকার করা সহজ কাজ ছিল না। কোন কোন সময় একটি শিকার ধরতে তার প্রচুর সময় লেগে যেতো। তবে কবুতরদের ধরা কিছুটা সহজ ছিল।

আদম সন্তান গাছ-গাছালীর ফল সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর বেশী করে গাছে ওঠা শিখে ফেললো। আর এভাবে সে পাখ-পাখালীর বাসায় পৌঁছে ওদের বাচ্চা ও ডিমের নাগাল পেয়ে গেলো। প্রথম প্রথম বুঝতে পারতো না যে, এসব ডিম কি জিনিস। পরে তার গুহায় কয়েকটা কবুতর পালার সময় লক্ষ্য করলো যে কবুতর ডিম পারে এবং ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে। সে এটাও বুঝলো যে, পাখীদের বাচ্চা জন্মানো আর মাটির উপর পশুদের বাচ্চা জন্ম দানের মাঝে ফারাক রয়েছে।

আরেকটি জিনিস যা আদম সন্তানকে আনন্দিত করেছিল তা ছিল তুলা গাছ। প্রথম প্রথম সে ভেবেছিল এ কোন কাজেরই নয়। কেননা তুলা গাছের মূলও খাওয়া যায় না, পাতাও না, ফুল তথা ফলতো নয়ই। কিন্তু যখন তুলার মোচা ফেটে নরম-সাদা তুলা বের হতে দেখলো তখন সে খুব খুশী হলো। সে ভাবলো বেশী করে তুলা জমিয়ে তা শুকনো খড়কুটার বদলে মাটিতে বিছানো হলে অনেক গরম ও আরামের হবে। তাই করলো সে। অবশ্য তখনো সে জানতো না যে গায়ের জামা কাপড় তৈরীতে তুলা কতো কাজে আসে।

আরেকটি ব্যাপার হলো এই যে, কয়েক মাস পর বর্ষা মওসুম এলো। কয়েক দিন বৃষ্টির পর দেখা গেলো তার শিকার ধরার ক্ষেত্রটি সবুজ শ্যামল হয়ে উঠছে। আদম সন্তান তখন আর আগেকার মতো ঘাস শাক-সবজী খেতো না। সে খাওয়ার অনেক কিছুর সন্ধান পেয়ে গেছে। এতো সব খাদ্যের মাঝে থেকে সে ঘাস পাতা খাওয়া প্রায় ভুলেই গেলো। কোন প্রয়োজনও আর ছিল না। কিন্তু কিছুকাল পর ওসব সবুজ ঘাসে ও গাছে সে দেখতে পেলো যে, পাখিদের জন্যে ছিটিয়ে দেয়া দানা ও বীচি জন্ম নিচ্ছে তখন সে তাজ্জব বনে গেলো। আগে এখানে এসব জন্ম নিতো না। কিন্তু এখন যা জন্ম নিয়েছে ঠিক ওসব গম, ধান, কাউন, যব, সূর্যমুখী ইত্যাদি যা সে দূর থেকে এনে পাখিদের দিতো। সে ভেবে নিলো ঃ "যেখানেই ওসব দানা ও বীচি ছিটিয়ে দেবো সেখানেই এগুলো জন্ম নেবে। যেমন করে খড়কুটা ও লাকড়ি বেশী দিলে আগুন বেশী হয়, যেমন করে পাখিদের ডিম থেকে বাচ্চা জন্ম নেয় এবং যেমন করে পশুরা বাচ্চা জন্ম দেয় ঠিক তেমন করেই দানাগুলো থেকেও ঘাস-গাছালী হয় এবং ওসব


www.pathagar.com

থেকে পুনরায় দানা জন্ম নেয়। সুতরাং কখনো কোন জিনিস শেষ হয়ে যায় না। বরং সব কিছুই বৃদ্ধি পায়, বেশী করানো ও তৈরী করা সহজ কাজই।"

আদম সন্তান চিন্তা করলো ঃ "অবশ্যই পরীক্ষা করবো।" সে একটি খালি জমি বেছে নিলো এবং একে কয়েক ভাগে ভাগ করলো। প্রতিটি ভাগে একেক প্রকারের বীজ তথা দানা ফেললো। কয়েক মাসের পরীক্ষায় সে ফল পেয়ে গেলো। গম, ধান, কাউন, যব, ফুলের দানা প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে ফলে উঠলো। সে আরো দেখলো গমের দানা থেকে কাউন হয় না, গমই হয়, কাউনের দানা থেকেও ধান হয় না, কাউনই হয়। একইভাবে অন্যান্য দানা। সে বুঝলো কোন একটি জাত অন্য জাতে পরিণত হয় না। নির্দিষ্ট জাত থেকে সে জাতই জন্ম নেয়। আর এভাবে সে কৃষি কাজ শিখে নিলো। তার কাজে অবশ্য অনেক ভুল-ত্রুটি ছিল, সবকিছু জানতো না। জানলেও ঠিক মতো ও সুচারু রূপে জানতো না। তবে প্রতিটি পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে সে নয়া নয়া বিষয় শিখে ও বুঝে যাচ্ছিল। সে এখন জানে যে, শুকনো মাটিতে দানা ফেললে তা থেকে চারা হয় না, পানির প্রয়োজন হয়। ভাজা ও আধ পোড়া দানা থেকে গাছ জন্ম নেয় না। চাষের জন্য ভাল ও শুকনো বীজ ফেলতে হয়। বীজগুলোকে মাটি নরম করে তার ভেতর ঢুকিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি ও ভালরূপে গাছ গজিয়ে উঠে। প্রভৃতি।"

কৃষি কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর একই সময় সে মাঝে মাঝে জঙ্গলেও ঢু মারতো। গাছে উঠে ইচ্ছে মতো ফল পেড়ে খেতো। নিজের আত্মরক্ষার জন্য সে গাছের ডাল দিয়ে তৈরী লাঠি হাতে রাখতো। লাঠি দিয়ে পশু তাড়ানো যায় এ বিষয়টি সে শিখে নিয়েছে। সে যখন গাছের উপর চড়ে বেড়াতো তখন সে নিশ্চিন্ত থাকতো যে, কোন হিংস্র প্রাণী তাকে হামলা করতে পারবে না। কেননা ওরা গাছে উঠতে পারে না। শুধু বিড়াল ও কাঠবিড়ালী গাছে উঠতে পারে। তবে ওরা তাকে দেখলে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। মানব সন্তান বহু সময় গাছে চড়ে কাটিয়ে দিতো। সে গাছের উপর থেকে নীরবে পশু-পাখিদের চলাচল দেখতো। এভাবে সে পশুপাখিদের প্রত্যেকের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতো। অবশ্য বানর চিনতে তার বেশ সময় লেগেছিল।

সে পেয়ারা গাছের সন্ধান পেলো সম্প্রতি। পেয়ারা খেয়ে বেশ মজা পেলো। কয়েক দিন যাবৎ সে জঙ্গলের ভেতরকার ওই পেয়ারা বাগানে আসা-যাওয়া করতে


www.pathagar.com

লাগলো। একদিন সে যখন পেয়ারা গাছের কাছে গেলো তখন দেখতে পেলো একটি বানর গাছের উপর। বানরের বেশ লম্বা লেজ। লেজ দিয়ে ডাল আঁকড়ে ধরে সে ঝুলতে পারে ও লাফিয়ে এ ডাল থেকে ওডালে যেতে পারে। উভয়েই উভয়কে দেখে ভয় পেয়ে গেলো। বানরও কোনকালে মানুষ দেখেনি। বানর একটি পেয়ারা মুখে দিলো এবং আরো কয়েকটি পেয়ারা ছিঁড়ে নিচে ফেললো। আদম সন্তান বেশ তাজ্জব হলো। কেননা এ পর্যন্ত কোন পশুকে গাছেও উঠতে দেখেনি এবং এভাবে ফল পেড়ে নিচে ফেলতেও দেখেনি। আদম সন্তান ভাবলো ঃ "আমিও না হয় গাছে উঠি। তখন বেশ মজা হবে। যদি এ পশু হামলা করে তাহলে গাছের ডাল ভেঙ্গে তা দিয়ে তাড়িয়ে দেবো।"

সে-ও আরেকটি গাছে উঠে পড়লো। বানরের সমান উঁচুতে উঠে বানরকে দেখতে লাগলো। বানরও তাকে দেখছে। আদম সন্তান দেখলো এই প্রাণী দেখতে অনেকটা তারই মতো। লম্বা হাতে তারই মতো আঙ্গুল রয়েছে। তার সাথে এর যে অনেক মিল। অবশ্য কিছুক্ষণের ভেতরই বানরের মনে ভয় ঢুকে গেলো। সে গাছ থেকে নেমে চলে গেলো। "ওহ্! তাহলে এটি তেমন বিপজ্জনক নয়!"



www.pathagar.com

পরদিন আদম সন্তান তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছালো পেয়ারা তলায়। কিছুক্ষণ পর বানরও এসে উপস্থিত। আদম সন্তান কয়েকটি পাকা পেয়ারা ছিঁড়ে নিচে ফেললো বানরের পায়ের কাছে। বানর বসে খাওয়া শুরু করলো। বুঝা যাচ্ছিল যে, সে অত্যন্ত খুশী হয়েছে। পেয়ারা খেয়ে তার নিজস্ব স্বরে কিচির মিচির করলো।

মানব সন্তান দেখলো বানরের কার্যাবলী তারই মতো। তবে ফারাক হলো তার ঐ লম্বা লেজ এবং গায়ের লোম। অবশ্য চোহারাটা ঠিক তার মতো নয়, পশুদেরই মতো। আবার চার পায়েই হাঁটাহাঁটি ও দৌড়াদৌড়ি করে। আদম সন্তান যতই অপেক্ষা করলো বানর কিন্তু গাছে আর উঠলো না। সে সাবধানে হাতের গাছের একটি শক্ত ডাল নিয়ে নিচে নেমে এলো। না, বানর কিছুই করলো না যা বিপজ্জনক হতে পারে।

এরপর কয়েকবার পরস্পরের দেখা হয়েছে। বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন একটি দুর্ঘটনা ঘটলো। আদম সন্তান যখন গাছে উঠে অপেক্ষা করছে তখন বানর এসে হাজির হলো গাছতলায়। আচমকা একটি হিংস্র প্রাণী এসে বানরকে হামলা করলো ও তাকে কামড়ে জখমী করে ফেললো। গাছের নিচে লড়াই চলছিল। আদম সন্তান কয়েকটি কাঁচা পেয়ারা ছুঁড়ে মারলো হিংস্র পশুর গায়ে। এরপর গাছের ডাল ভেঙ্গে তা ছুঁড়ে মারতে লাগলো। হিংস্র প্রাণীটা আঘাত খেয়ে পালিয়ে গেলো। বেচারা বানর মারাত্মকভাবে জখমী হয়ে দ্রুত শ্বাস ফেলছিল। আদম সন্তান নিচে এসে দেখলো বানর নড়াচড়া করছে না। তবে তার শরীর তখনো ঠান্ডা হয়ে যায়নি। সে বানরটি টেনে নিয়ে চললো গুহার দিকে, পথে আরেকটি ভেড়া পেলো। কোন নেকড়ে হয়তো একে মেরে কিছুটা খেয়ে চলে গেছে। সে ভেড়াটাকেও কাঁধে তুলে নিলো।

পরদিন আগুন জ্বালিয়ে প্রথমতঃ ভেড়ার কিছু গোশত পুড়িয়ে কাবাব করে খেলো। এরপর মৃত বানরের গোশত পুড়িয়ে খাওয়ার চেষ্টা করলো। না, খুবই বে-মজা ও তিতা। হঠাৎ তার খেয়াল হলো বানর আর ভেড়ার চামড়া তার গায়ে দেয়ার জন্যে বেশ ভাল হবে। কিন্তু ওদের চামড়া ছেলানো খুব শক্ত কাজ ছিল।

সে দু'তিন দিন যাবৎ গাছের চৌকো ডাল ও ধারালো পাথর দিয়ে চেষ্টা করে বানর ও ভেড়ার চামড়া খুলে ফেললো। এরপর বানরের গোশত ও হাড় ফেলে এলো দরিয়ায়। চামড়া গায়ে দিতে গিয়ে দেখে বেশ আঁঠালো ও ঠান্ডা। তখন সে শুকনো খড়কুটার উপর ওগুলো রেখে দিলো যাতে কয়েকদিনে শুকিয়ে যায়। ভেড়ার পেটে সে যে লম্বা নাড়ি-ভুঁড়ি পেয়েছিল তাকে বেশ ভালই মনে হলো। পানিতে ধুয়ে


www.pathagar.com

পরিষ্কার করে একে টেনে টেনে লম্বা করলো। এরপর রোদে দিয়ে রাখলো। সে কখনো এমন লম্বা জিনিস দেখেনি। নাড়ি শুকানোর পর একে টেনে নিয়ে যেতে থাকলে এর একটি মাথা পেচিয়ে গেলো মাটিতে পড়ে থাকা গাছের একটি ডালে। সে যতই টানলো ততই তার গিট মজবুত হলো। এরপর সে কাছে গিয়ে হাতে সে গিট খুললো। আর এভাবে সে গিট দেয়া ও খোলা শিখে নিলো। সে ভাবলো, এ লম্বা জিনিস দিয়ে তাহলে অনেক কিছুকেই বেঁধে রাখা যাবে। যেমন একটি পাখি বা মোরগ ধরে এ নাড়ি দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে রাখা যাবে। তাতে পালিয়ে যেতে পারবে না। নাড়িটি উঁচু গাছের ডালে বেঁধে একে ধরে ঝোলাও যাবে– দোলও খাওয়া যাবে। গাছ থেকে ঝোলা ও দোল খাওয়া কতোই না মজা। ঠিক যেনো বানরের মতো। সেও লেজের সাহায্যে দোল খেতো, ঝুলে পড়তো!

আরো দু'তিন দিন পর যখন ভেড়ার গোশতে গন্ধ ধরে যায় তখন সে ওগুলো নিয়ে ফেলে এলো দরিয়ায়। গোশত দরিয়াতে পড়ার পরই সে লক্ষ্য করলো অনেক মাছ এসে সেখানে ভিড় করে গোশত খাওয়া শুরু করলো। জোরালো ঢেউ কয়েকটা মাছকে ডাঙ্গায় তুলে দিলো। সে আগুনে পুড়িয়ে মাছ খেয়ে দেখলো বেশ মজাই লাগে।

আদম সন্তান ভেড়ার শুকনো চামড়া দিয়ে বিছানা তৈরী করলো আর বানরের চামড়া গায়ে পেচিয়ে পরিধান করলো। বেশ আরামদায়ক। এরপর থেকে সে প্রতিদিন বানর, হরিণ, ভেড়া ও ছাগলের সন্ধানে লেগে যায়। সে ওদের পোষ মানানোর পথ জেনে গেছে। দানা দিলে কবুতর পোষ মানে, ঘাস ও খড়কুটা দিলে হরিণ, ছাগল ও ভেড়া পোষ মানে, গোশত দিলে কুকুর পোষ মানে। সে ওসবকে গাছের সাথে বেঁধে পানি ও খাওয়া-দাওয়া দিতো। এভাবে ক'দিনের মাঝেই এরা গৃহপালিত হয়ে যেতো। তাকে ছেড়ে যেতো না। কুকুর পোষ মানানো ধারণাতীত সহজ ছিল। কুকুরকে যে নাড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল সে তা খেয়ে ফেললো। কিন্তু তার প্রভুর কাছ থেকে উপকার পেয়ে সে বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে গেলো। সে আর আদম সন্তানের সঙ্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলো না। আদম সন্তানও কুকুরকে তার বন্ধু হতে দেখে পশুপাখির গোশত খেতে দিতো।

•



www.pathagar.com

# সৃজনশীল কর্মমুখর মানব সন্তান

হাই বিন ইয়াকজানের বয়স এখন আট বছর। তার জীবনের সাথে এখন যোগ হয়েছে বহু পশুপাখি। তবে সে যতই চিন্তা করতো যে তার মতো কোন প্রাণী কেনো দুনিয়াতে আর দেখা যায় না সে এর কোনই জবাব পেতো না। দ্বীপটিই ছিল তার দুনিয়া। এ দুনিয়ায় তার মতো আর কেউ চিন্তা করতে ও বুদ্ধি খাটাতে পারতো না। কাকেরা সব সময় এক ধরনের বাসাই বানাতো, কুকুরেরা সব সময় এক ধরনের জীবনই যাপন করতো। কবুতররাও সব সময় একই ধরনের আচরণ করতো। ছাগল ভেড়া কখনো খড়কুটা ও ঘাস জমিয়ে রাখার চিন্তা করতো না। যখন ক্ষুধার্ত হতো তখন ছাড়া পেলে চলে যেতো বন-বাদাড়ে ঘাস খাওয়ার জন্যে। এরপর ফিরে আসতো আদম সন্তানের ঘরে। ছাড়া না পেলে ক্ষুধা লাগলে ভ্যা ভ্যা করতো। ভ্যা ভ্যা অর্থ আমি এখন ঘাস খাবো! কবুতরও কোন কাজই করতো না। এদের জীবনে কখনো পরিবর্তন আনতো না। কখনো নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করতো না, নতুন কোন কাজ করতো না। এরা কেউই অন্য কাউকে কাজে খাটাতে পারে না। কেবল সে-ই ওদের সবাইকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজে লাগাতে পারছে। সে এ কারণে বেশ আনন্দিত ও খুশী।

সে সকল প্রাণীর আওয়াজই শিখে ফেলেছে এবং ওদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে। অবশ্য সে ওসব শব্দের অর্থ কিছুই বুঝেনি। কুকুর যখন ভয় পেতো কিংবা ভয় দেখাতো তখন ঘেউ ঘেউ করে, ভেড়া যখন ক্ষুধার্ত হয় তখন ভ্যা ভ্যা করে। বেশ ভাল কথা। কিন্তু মধ্য রাতে মোরগের ডাকের অর্থ কী হতে পারে? আজব ব্যাপার এই মোরগের। মধ্যরাতে যখন শিয়াল ওকে খেয়ে ফেলতে আসে তখন কোন ডাকই দেয় না। অথচ যখন কোন বিপদাপদ বা খবরই নেই তখন কীনা সে এভাবে উচ্চস্বরে ডেকে উঠে! মানব সন্তান দেখতে পেলো যে, সকল প্রাণীর ভেতর কুকুরই বেশী বিশ্বস্ত। কুকুর বন্ধু ও শত্রুকে সহজে চিনতে পারে, যুদ্ধ করতে জানে এবং মানব সন্তানের জন্যে নিজের জানকেও বিপদে ফেলতে পারে। কিন্তু তারপরও কুকুর কোথায় আর মানব সন্তান কোথায়!



www.pathagar.com

একদিন সে ভাবতে লাগলো ঃ "যখন গাছগাছড়া, লতাপাতা, ফল-ফসলাদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ দানা ও বীচি থেকে নতুন করে জন্ম নেয়, কুকুরের বাচ্চা কুকুর থেকে জন্মে, ভেড়ার বাচ্চা ভেড়া থেকে আসে এবং পাখিদের বাচ্চা পাখিদের ডিম থেকে ফুটে তখন আমি নিজে কোত্থেকে এলাম? নিশ্চয়ই আমি সেই হরিণীর পেট থেকে আসিনি। যদি তাই হতাম তাহলে তো হরিণের মতোই হতাম। কিন্তু আমার মতো যে একজনও নেই।" এ ব্যাপারে সে যত চিন্তাই করুক না কেনো কিছুই তার বুঝে আসছিলো না। এরপর নিজে নিজেই বলতো, এটা জানার বহু সময় পড়ে আছে, এতো তাড়াহুড়ার কি আছে? শেষ পর্যন্ততো জানবোই আসলে কী ব্যাপার।

সে দ্বীপের আশপাশ সম্পর্কে জেনে নিয়েছে। দ্বীপের চারপাশেই শুধু পানি আর পানি। দ্বীপটিতেই কেবল মাটি ও শুকনো রয়েছে। কিন্তু এতো সব পানি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে? এ দ্বীপের মতো কী আর কোন স্থলভাগ আছে কোথাও? সে চাঁদ, সুরুজ, তারকা, আকাশমন্ডলী নিয়ে চিন্তা করতো। তার প্রশ্ন, এরা কে? এসব কোত্থেকে এসেছে? কোথায় এদের গতি? এদের কাজ কী? আদম সন্তানের এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার কেউ ছিল না। তার খুব দুঃখ লাগত যে সে ওসবকে জানতে ও বুঝতে পারতো না। নিজেকে বেশ দুর্ভাগ্য বলে মনে হতো। অবশ্য তার জন্য অনেক কাজ ও সময় বাকী রয়েছিল যখন সে নিজেই বহু কিছু করতে পারবে ও বুঝতে সক্ষম হবে।

সে যে গুহাটায় বসবাস করতো তা ফলের গাছ গাছালী, আখের বন ও মিঠা পানির নদী থেকে অনেক দূরে ছিলো। দরিয়ার পানিতো অনেক বে-মজা ও নোনা। খাওয়াই যেতো না। কোন প্রাণীই তা খায় না। তার ঘর যদি আরো ভাল জায়গায় থাকতো তবে তা কতোই না ভাল হতো।

একদিন সে জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। পাশাপাশি ঘনভাবে দাঁড়ানো গাছগুলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেনো দেয়াল। গাছগুলোর পরস্পরের ব্যবধান খুবই কম ছিল। আদম সন্তান ভাবলো ঃ "গুহার দেয়ালতো পাথর ও মাটির তৈরী আর এ দেয়াল হচ্ছে গাছের তৈরী। এখন যদি সেও গাছের কাঠ দিয়ে এরকম একটি গোলাকার দেয়াল বানায় আর এর মাথায় কাঠ শুইয়ে দেয় তাহলে সেটি হবে কাঠের গুহা! এ গুহার দরজাকেও কাঠ দিয়ে বানানো যাবে। তাহলে পাথর দিয়ে আর দরজা বন্ধ করতে হবে না। এ ধরনের গুহাই হবে সহজ, সুন্দর ও উত্তম।"



www.pathagar.com

সে বসে বসে চিন্তা করলো। ঠিক করলো একটি ভালো জায়গা বেছে ওখানেই কাঠের গুহাটি বানাতে হবে।

অনেক দিন তার লাগলো কাঠ ভেঙ্গে জড়ো করতে এবং ওগুলোকে সজোরে মাটির নিচে পুঁততে। সে ধারালো পাথরের সাহায্যে কাঠ কেটে শেষ পর্যন্ত একটি কাঠের কামরা তৈরী করলো যার কোন বিশেষ আকার ছিল না। না ছিল চতুর্ভুজ, না ছিল পঞ্চভুজ, না বৃত্তাকার। অনেকটা ওই গুহার মতোই ছিল এর আকার। তবে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ফুরফুর করে বাতাস ঢুকে যেতো ঘরের ভেতর। সে কাঠের ফাঁকে ফাঁকে খড়কুটা ঢুকিয়ে তা বন্ধ করে দিলো। ঘরের ছাদ বানাতে গিয়ে দেখলো যে, সোজা

কাঠ বেয়ে উপরে উঠা খুবই কঠিন কাজ। সে তাই দেয়ালের পাশে মাটি ও পাথর জড়ো করে ঢিপি তৈরী করলো এবং এর উপর দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা কাঠ ফেললো দেয়ালের উপর। যেখানে কাঠগুলো বসতো না, নড়বড় করতো সেখানে সে ভেড়া ও ছাগলের শুকনো নাড়ি-ভুঁড়ি দিয়ে ওগুলোকে শক্ত করে বাঁধতো। ছাদ তথা চালা তৈরী শেষ হলে সে ঘরের ভেতর এসে নেড়েচেড়ে দেখলো দেয়ালের যেদিকে সে মাটি ও পাথরের উঁচু ঢিপি বানিয়েছে সে দিকটা বেশ মজবুত হয়েছে। এছাড়া ওদিকে কোন ফাঁক-



www.pathagar.com

ফোঁকড়ও ছিল না। তাই সে মাটিতে পানি মিশিয়ে কাদা তৈরী করে ওই কাদা লেপে দিলো কাঠের দেয়ালের সর্বত্র। ব্যস সব ফাঁক ও ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু বৃষ্টি এলে চালা দিয়ে ঘরের ভেতর পানি পড়তো। তখন সে করলো কী ওই চালার উপর উঠে অনেক খড়কুটা ছড়িয়ে দিয়ে উঁচু করলো এবং সেই খড়কুটার স্তূপের উপর সুন্দর করে ছড়িয়ে দিলো কাদা মাটি। এখন ঠিক হয়েছে। চিকন চিকন হালকা কাঠ দিয়ে সে দরজাও বানিয়ে ফেলেছে। নাড়ি-ভুঁড়ি দিয়ে দরজাটাকে বেশ করে বুনে সাজালো এবং দেয়ালের এক পাশের কাঠের সাথে খাড়া করে বাঁধলো। দিনের বেলায় সে ঘর তৈরীর কাজে ব্যস্ত থাকতো এবং রাতে চলে যেতো তার পাথুরে গুহায়।

ঘর বানাতে গিয়ে আদম সন্তান কাঠ মিস্ত্রীর কাজ শিখে ফেললো। পাথর দিয়ে যন্ত্রপাতি বানালো। সৃজনশীল একেক চিন্তা ভাবনা থেকে জন্ম নিতে লাগলো নয়া নয়া চিন্তা-ভাবনা। নতুন ঘরে যখন চলে যাওয়ার জন্য তৈরী হলো তখন তার প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য জিনিসগুলো একে একে ঘরে পৌঁছাতে লাগলো। বিছানো তুলাগুলো উঠাতে গিয়ে দেখে সমস্ত তুলা পরস্পরের সাথে লেগে জড়িয়ে গেছে এবং একটি একক বিছানায় পরিণত হয়েছে। সে খুশীতে বাগ বাগ হয়ে গেলো। তাহলে তো তুলা অনেক উপকারী বস্তু! সে তুলাগুলোকে হাত দিয়ে টেনে জমাতেও পারছে এবং ইচ্ছা মতো লম্বা, পুরো সব আকারেই গড়ে তুলতে পারছে। মজার জিনিস তাহলে এটি! সে তুলাগুলোকে মুঠি মুঠি পেচিয়ে একের সাথে অপরকে জুড়ে দিয়ে রশিও বানাতে পারছে, আঙ্গুল দিয়ে চেলে গায়ে দেয়ার পোশাকও বানাতে পারছে। নতুন ঘরে উঠে সে আরো তুলা জমিয়ে তার প্রয়োজনীয় লেপ, তোষক ও গায়ের পোশাক তৈরীতে মনোযোগ দিলো।

একদিন সে দেখতে পেলো একটি ভেড়ার গা থেকে জটা পাকিয়ে পশম উপড়ে পড়লো। সে ভেড়ার গায়ে হাত বুলাতেই আরো অনেক পশম উঠে এলো। সে এসব পশম জমা করে দেখলো বেশ নরম, কোমল ও গরম। সে তুলার মতো পশম নিয়েও নানা কিছু বানানোর পরীক্ষা চালালো। ছাগল ভেড়ার দুধ ও গাছের আঠা দিয়ে সে পশমগুলোকে বিছিয়ে বিছিয়ে পরস্পর জড়িয়ে দিতে লাগলো। এভাবে সে একটি সুন্দর কম্বল বানিয়ে ফেললো। এরপর থেকে সে ছাগল ভেড়া ও দুম্বা খোঁজ করে করে সেগুলোকে তার পোষ মানিয়ে নিলো। তার বাড়ির কাছে এখন এক পাল ছাগল ভেড়া ও দুম্বা থাকে। এসব থেকে সে দুধ, পশম, চামড়া ও গোশত প্রয়োজন মতো ব্যবহার


www.pathagar.com

করতো। সে বাচ্চাদের পশম ধারালো পাথর দিয়ে কেটে পরীক্ষা করে দেখলো তেমন জোড়া লাগে না। এতে অবশ্য সে উত্তমরূপে সূতা তৈরীর কাজ, তাঁতের কাজ ও চামড়া শিল্পের কাজ শিখে নিলো। সে এখন সুতা দিয়ে কাপড়ও বুনতে পারে।

আদম সন্তান ভাবলো ঃ "এভাবেতো বেশ ভালই কাটছে। মানুষ যে কোন কাজ করতে চায় তাই করতে পারে। তবে এর জন্যে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করতে ও বুদ্ধি খাটাতে হয়। আর সাথে সাথে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবশ্যক। ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও মনোযোগিতার মাধ্যমে সুচারুরূপে কাজ সম্পাদন করা যায়।" আদম সন্তান দিন দিন অনেক বুদ্ধিমান, চালাক চতুর, সজাগ সচেতন ও রুচিশীল এবং শিল্পমনা হচ্ছিলো। সে যখন দেখলো তার মাথার চুল অনেক বড় হয়ে গেছে, গাছের ডালপালায় আটকে যায় তখন ধারালো পাথর দিয়ে বসে বসে চুল কেটে ছোট করে ফেললো। এরপর ওই চুলগুলো ভেড়া ও দুম্বার পশমের সাথে মেশালো। এর সাথে দুধ ও আঠা যোগ করে মাথায় পড়ার মতো টুপী তৈরী করে ফেললো। এখন সে মাথায় দিয়ে দেখলো শীতে বেশী ঠান্ডা লাগে না আবার গাছগাছড়া ও দেয়ালে তার মাথা ঠেস খায় না। ঠেস খেলেও ব্যথা পাওয়া যায় না।

আরেকটি নয়া কাজ সে শিখে ফেললো। একদিন বনে ঘুরে ফেরার সময় তার হাতে ছিল একটি লম্বা নাড়ি। সে নাড়িটির এক মাথা ধরে তার মাথার চারদিকে ঘুরাচ্ছিল। নাড়ি ঘুরার সময় বাতাসে ধাক্কা খেয়ে পত্‌পত্‌ শব্দ সৃষ্টি করছিল। শব্দটি তার কাছে বেশ ভাল লাগছে। এরপর কী ভেবে নাড়ির অপর মাথায় একটি পাথর বেঁধে আবার ঘুরানো শুরু করলো। এবার আরো দ্রুত ঘুরতে এবং ভন ভন শব্দ করতে লাগলো। সে এরপর নাড়ির দু'মাথা হাতে নিয়ে এর মাঝ বরাবর পাথর বেঁধে ঘুরাতে লাগলো। পাথরের ভারে নাড়িটি বেশ দ্রুত ঘুরছে। তার কাছে এ খেলা বেশ আনন্দদায়ক মনে হলো। সে প্রায়ই এ কাজ করতে লাগলো। একদিন এমনিভাবে নাড়ির সাথে পাথর বেঁধে ঘুরাতে থাকলে হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে পাথরটি ছুটে গেছে এবং অনেক অনেক দূরে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়েছে। সে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো এবং বলতে চাইলো ঃ "এটাইতো চাই, বাহবা! কী সুন্দর আবিষ্কার। আমি খালি হাতে ঢিল মেরে এতদূর পাথর পৌঁছাতে পারি না। ব্যস, এখন থেকে এভাবে ধারালো পাথর টুকরো ছুঁড়ে মারবো পাখি ও পশুদের দিকে। তাহলে ওদের শিকার করা সহজ হবে। সে পাথর নিক্ষেপের পরীক্ষায় মেতে উঠলো। একবার পাথর মারার সময়


www.pathagar.com

নাড়ির এক মাথা হাত থেকে ছুটে গেলো। এতে দেখা গেলো পাথর টুকরা আরো বহু দূরে গিয়ে পড়েছে। বাহবা! কী মজা! আদম সন্তান এখন এভাবে গাছের অনেক উপরেও পাথর ছুঁড়ে মারতে পারে। এসব পরীক্ষা চালাতে চালাতে সে এক সময় তীর ধনুকও বানিয়ে ফেললো। একটি গাছের ডাল বাঁকিয়ে এর দু'টি মাথা দুম্বার নাড়ি দিয়ে টেনে বেঁধে নিলো। এরপর এ নাড়ির মাঝখানে পাথর টুকরো রেখে এক হাতে চেপে ধরতো পাথর আর অন্য হাতে টেনে ধরতো ধনুকের বাঁট। ব্যস, লক্ষ্যবস্তু স্থির করে ছুঁড়ে দিতো পাথর ধরা হাত। সাঁই করে পাথর ছুটে যেতো বিদ্যুৎগতিতে। এছাড়া সে গাছের ডালের পুড়ে যাওয়া চৌকা ও ধারালো মাথা দিয়ে হিংস্র প্রাণীদের আঘাত ক'রে মেরে ফেলতে পারতো। বর্ষার মতো এসব লাঠি দিয়ে পশুদের পেটের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত ছিদ্র করে ফেলতে সক্ষম হতো। তাই সে আর কোন হিংস্র পশুপাখিকেই ভয় করতো না।

একদিন খুব বেশী শীত পড়ে গেলে সে আগুনের কুন্ডলী তৈরী করলো ঘরের ভেতর। সাবধানতা গ্রহণ না করায় আগুন ছড়িয়ে পড়লো এবং তার কাঠের ঘরে আগুন লেগে গেলো। তার সকল সাজ-সরঞ্জাম ও পোশাক পরিচ্ছদ সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। কী ভয়ানক ঘটনাই না ঘটলো। তার আর ঘর রইলো না। সে রাতে সে তার পুরাতন গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। তার ইচ্ছে করলো চিৎকার করে কাঁদতে। কিন্তু পরে চিন্তা করলো ঃ "কান্না দিয়ে ঘর তৈরী হবে না, বরং এ দুই হাতের দ্বারাই তৈরী হবে। হাত দুটো তো আছে।" তার মনে তখন সাহস এলো এবং শেষ পর্যন্ত তার শক্তির উপর প্রবল বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ায় উচ্চ কণ্ঠে হেসে বললো ঃ "আবারো ঘর বানাবো, আরো সুন্দর করে বানাবো। এরপরও যদি পুড়ে যায় পুনরায় বানাবো।" মনে মনে বেশ সান্ত্বনা পেলো। ভাবলো ঃ "যার ক্ষতি পূরণ রয়েছে তার জন্যে আফসোসের কি আছে?"

পরদিন গিয়ে দেখলো ঘরের দেয়ালের মোটা মোটা কাঠগুলো পর্যন্ত পুড়ে গেছে। তবে যা পুড়েনি তাহলো দেয়ালের পাশে উঁচু করে রাখা মাটির ঢিপিটি। বরং তা আগুনের তাপে আরো শক্ত ও মজবুত হয়েছে।

এ আগুন লাগা থেকে সে নতুন বিষয় শিখলো। এবার সে ঘরের দেয়াল নির্মাণ করলো কাদামাটি ও পাথর টুকরোর মিশ্রণ দিয়ে। এরপর খড়কুটা দিয়ে উভয় পাশ থেকে দেয়ালগুলোতে আগুন দিলো যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এতে দেখা



www.pathagar.com

গেলো দেয়াল পাথরের মতোই শক্ত হয়ে পড়েছে। এরপর ছাদ তৈরী করলো এবং ছাদের উপরের দিকে ও নিচের দিকে কাদামাটির প্রলেপ দিলো। ছাদের শুকনো খড়কুটা ও ঘাস যখন কাদা মাটির সাথে মিশে গেলো তখন বেশ সহজে দেয়ালের উপর যুঁতসইভাবে বসে গেলো। আদম সন্তান এভাবে খড়কুটা ও কাদামাটির সংমিশ্রণে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ইট বানানোটাও শিখে গেলো। সে তখন ভাবলো, আগুন দিয়ে যদি কাদা ও নরম মাটিকে এতো শক্ত করা যায় তাহলেতো পানি আনা-নেয়ার জন্যে আর লাউয়ের খোলস ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। সে নরম ও কাদা মাটি দিয়ে পাত্র তৈরী করলো এবং একে আগুনে দিয়ে পোড়ালো। বেশ ঠিকই হয়েছে। এরপর থেকে সে বহু ধরনের ও আকারের মাটির পাত্র নির্মাণ করলো। আর এভাবে কুমারের কাজ করতে গিয়ে সে চুনামাটি, সিমেন্ট, গ্রাফাইট ও অন্যান্য সামগ্রীর সাথে পরিচিত হলো। সে পাথর পুড়িয়ে পুড়িয়ে অনেক খনিজ পদার্থ বের করা শুরু করলো। সে এখন জানে দ্বীপের কোন অংশের পাথরে কী কী গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আদম সন্তান এখন একজন শিল্পী, শিল্পপতি ও নির্মাতা।

আদম সন্তান তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লবণ পাথরের সাথে পরিচিত হলো। এখন থেকে সে দরিয়ার নোনা পানির পরিবর্তে ঐ পাথুরে লবণ ব্যবহার করা শুরু করলো। তার পরীক্ষার ভেতর দিয়ে একটি নয়া জিনিস শিখলো। কোন কোন পাথর আগুনে গলে যায় এবং এ থেকে নতুন নতুন জিনিস যেমন লোহা, কাঁচ, রোপা, সোনা, লীড প্রভৃতি তৈরী হয়। সে যখন প্রথমবার কাঁচের সাথে পরিচিত হলো তখন তার সে যে কী আনন্দ! মসৃণ কাঁচ ও ইস্পাতের পাতে সে নিজের চেহারা দেখতে পেলো। এখন আর সে নিজেকে দেখার জন্যে পানিতে নামতে বাধ্য নয়।

সে যতই আবিষ্কার করতো ততই মজা ও আনন্দ উপভোগ করতো। তবে সে মনে করতো, এসব কিছুই হলো আগুনের বাহাদুরী। আগুন হচ্ছে এসবের জননী। তাহলে সূর্য কী? তার মতে যেটা যত বেশী উজ্জ্বল তত বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এতো উজ্জ্বলতার অধিকারী আগুনকে তাহলে কে প্রজ্জ্বলিত করে? আমিও যেমন করে এতো সব জিনিস তৈরী করছি অথচ পশুপাখিরা তা জানেও না বুঝেও না তেমনি এমন কেউ আছেন যিনি আমার চেয়ে বেশী জানেন, বেশী বোঝেন। তিনিই সূর্যকে জ্বালিয়ে দেয়। আহ্! তাকে যদি আমি বুঝতে পারতাম!”

এ অজানা দ্বীপের আদম সন্তানটি কেবল কথা বলতে পারতো না, ভাষাই জানতো



www.pathagar.com

না। শুধু পশুপাখিদের ভাষা জানতো। তবে যেহেতু সে মানব সন্তান সেহেতু সে সবই বুঝতে পারতো, অনুভব করতো। তাকে কেবল শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া হয়নি, আদব-কায়দা, আচার-ব্যবহার কেউ শেখায়নি। সে পশুদের আওয়াজ শুনে শুনেই শিখে নিয়েছে। আদম সন্তান বুঝতে পারছিল "নিশ্চয়ই আরেকজন রয়েছে যাকে আমি জানিনে কে? সে এমন সব কাজ করে যায় যার সব আমি বুঝিনে।"

আদম সন্তান ক্রমশ স্রষ্টায় বিশ্বাসী ও স্রষ্টা তাত্ত্বিক হয়ে উঠেছে। একদিন তার কোন কিছুই ভাল লাগছিল না। সে কিছুতেই মন বসাতে পারছিল না। সে অলসতা বোধ করছিল। তাই ঘরের সামনেই বসে ছিল। তার মাথার উপর গাছের ডালে কবুতররা খেলায় মেতে আছে। রৌদে ওদের ছায়া এসে পড়েছে নিচে তারই আশপাশে। সে ছায়ার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারতো কবুতররা আসছে, যাচ্ছে, বসছে, খেলা করছে। ছায়া দেখেই সে গুণতে পারছিলো কয়টি কবুতর গাছের ডালে রয়েছে, কার মাথা কোনদিকে, কিভাবে পাখা মেলে ও কীভাবে এসে বসে। ওদের ছায়া দেখে দেখে তার মন খুশীতে ভরে যায়। সে খেয়ালী মনে একটি চিকন কঞ্চি নিয়ে দুটো কবুতরের ছায়ার চারপাশ মাটিতে এঁকে ফেললো। পরে কবুতররা উড়ে গেলেও ছায়ার দাগ মাটিতে রয়ে গেলো। এ কাজে সে বেশ আনন্দ পেলো। এরপর সে ঐ কঞ্চি দিয়েই তার ছাগলের ছায়া, নিজের ছায়া ও গাছের ছায়া এঁকে ফেললো। রাতে সে ঘরের দেয়ালে গাছের আকৃতি আঁকার ইচ্ছে করলো। কিন্তু সেখানে গাছের কোন ছায়া ছিল না। সে গভীর চিন্তা করতে লাগলো গাছের ছায়া কেমন, ডালপালা কেমন, কবুতরের ছায়া কেমন ইত্যাদি। সে হাতে কাঠ নিয়ে দেয়ালে স্মৃতি থেকে ছায়া আঁকার চেষ্টা করলো। কিন্তু দেয়ালে ভাল দাগ পড়লো না। তবে যতটুকু দাগ পড়েছে তাতে মনে হলো সে যে গাছের চিত্র এঁকেছে তা তার ঘরের পাশেরটির নয়, বরং জঙ্গলের কোন গাছের। তখন তার মাথায় এলো, তাহলে সবকিছুর আকৃতিই আঁকা যায়। আধপোড়া কাঠ দিয়ে যখন সে আঁকতে চেষ্টা করলো তখন বেশ ভাল হয়ে দাগ পড়লো, রং গভীর হলো। এরপর থেকে সে কাঠ কয়লা দিয়ে অঙ্কন শুরু করলো।

ধীরে ধীরে সে শিখলো যে, কোনকিছুর ছবি আঁকতে হলে ঠিক ওই বস্তুর দৈর্ঘপ্রস্থ্য ঠিক রাখার কোন প্রয়োজন নেই। ছোট আকারে আঁকলেও তাকে চেনা যাবে। এভাবে


www.pathagar.com

আদম সন্তান চিত্রশিল্পী হলো। এতে করে বেকার সময় কাজে লাগানোর উপায় হাতে এলো। যখন সে ঘরে থাকতো এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকতো না তখন সে মসৃণ সমতল পাথরের উপর চিত্র অঙ্কন করতো। এরপর সে হাঁস-মুরগী, পাখি ইত্যাদির আকৃতি মাটি দিয়ে বানানোর চেষ্টা করলো এবং আগুনে পুড়িয়ে সেগুলোকে শক্ত ও মজবুত করে নিলো। এ ভাবে সে একজন পুরাদস্তর ভাস্কর শিল্পীও হয়ে গেলো। কিন্তু সে ভাষা জানতো না। সে একের পর এক চিত্র এঁকে ও ভাস্কর তৈরী করে বলতো ঃ "এটা ছাগল, এটা কাক, এটা কলাগাছ, এটা আঙ্গুর লতা, এটা ফুল, এটা পেঁপে ইত্যাদি ইত্যাদি।" এসব করে সে খুব মজা পেতো ও আনন্দে চিল্লিয়ে উঠতো। সে যেনো কাউকে ডেকে বলতে চাইতো ঃ "দেখে যাও, আমি নিজেই মাটি দিয়ে গাছ বানিয়েছি, ছাগল বানিয়েছি...।" কিন্তু তার আনন্দে কেউ অংশ নেয়ার ছিল না, কেউ তাকে উৎসাহ দিতো না, কেউ তাকে বলতো না, বাহ্‌বা! সুন্দর এঁকেছো, সুন্দর বানিয়েছো!" ছাগলের মূর্তি বানিয়ে সে ছাগলের সামনে রাখতো। কিন্তু ছাগল এতে

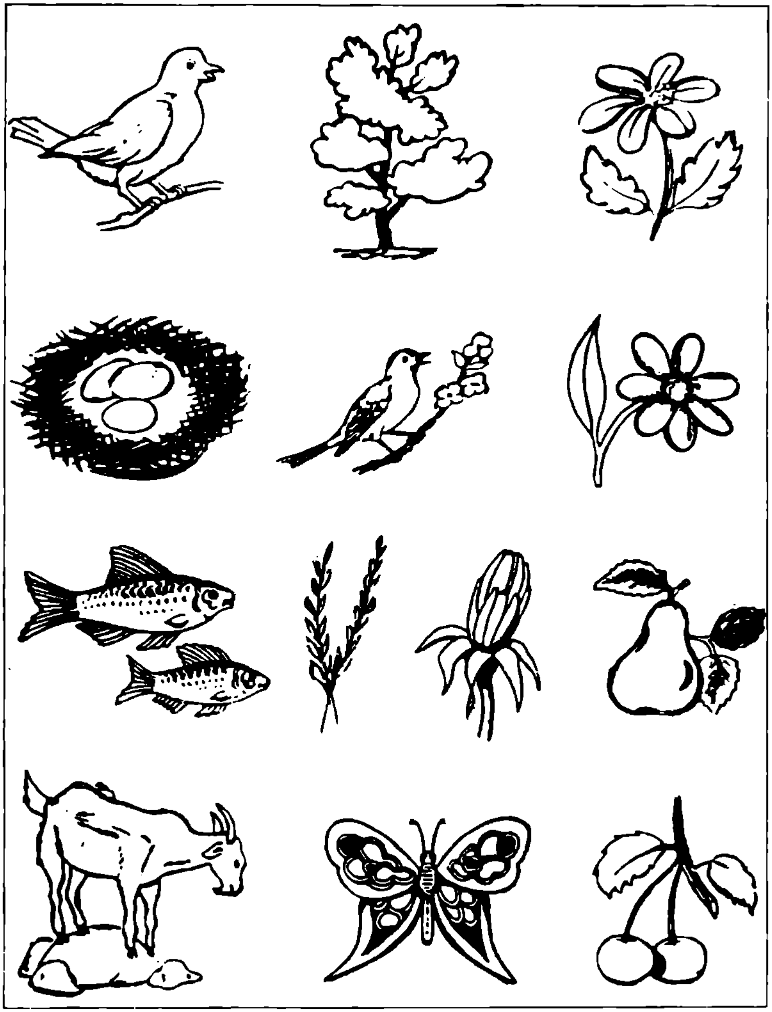



www.pathagar.com

খুশী হতো না। সে সূর্য আঁকতো, চাঁদ আঁকতো। কিন্তু পশুপাখিদের দেখালে কী হবে? ওরা এসবের কিছুই বুঝতো না। কবুতররাও এমন কিছু করতো না যে, বুঝা যাবে ওরা এসব দেখে আনন্দ পেয়েছে। বাল্য বয়সে মানব সন্তান উৎসাহ চায়, প্রশংসা চায়। সহমর্মী ও সমচিন্তার মানুষ চায়। কিন্তু দ্বীপে এসবের কোন পাত্তাই ছিল না। কেউ তাকে চিনতো না, জানতো না। একদিন সে একটি শ্বেত পাথর কুড়িয়ে আনলো এবং এর উপর কয়লা দিয়ে তার পোষা কুকুরটির ছবি আঁকলো। ঠিক তার কুকুরটারই মতো হয়েছে। সে ছবিটি কুকুরকে দেখালে কুকুর ছবিটির দিকে কতক্ষণ তাকালো এরপর বিরক্ত হয়ে চিল্লিয়ে উঠলো "ঘেউ ঘেউ ঘেউ..."

আদম সন্তান তখন চিন্তা করলো, "এখন একটা কিছু হলো, এখন একজনকে পাওয়া গেলো যে বুঝতে পারছে যে আমি কী আঁকতে চেয়েছি।"

www.pathagar.com

# আদম সন্তানদের সাথে
# আদম সন্তান

দ্বীপবাসী আদম সন্তানের বয়স এখন চৌদ্দ বছর। গত তেরটি বছর যাবৎ সে একাকী এক বন্য প্রাণীর মতো এ দ্বীপে কাটিয়ে দিলো। সে জানতেও পারেনি যে, এ দ্বীপের বাইরে কী খবরাখবর চলছে। এতোদিন পর্যন্ত কোন মানব সন্তানের পা পড়েনি এ দ্বীপে। এ দূরবর্তী দ্বীপটি নৌ চলাচল পথে অবস্থিত ছিল না। তাই কখনো কোন কিশতি বা যাত্রী সেখানে আসেনি। কিন্তু যে কোন দিন যে কোন ঘটনাই ঘটে যেতে পারে।

একটি বিরাট মালবাহী কিশতি সেবার সমুদ্র পথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কিশতিটিতে সাতজন আরোহী। ইয়াকজানের ডুবে যাওয়া কিশতির চেয়ে এটা অনেক বড়। পথ চলতে চলতে একদিন প্রচন্ড এক তুফানে পড়লো কিশতি। তুফানের তোড়ে পাল ছিঁড়ে উড়ে গেলো। সাগরের উত্তাল তরঙ্গ ও ক্ষীপ্র স্রোত কিশতিটাকে ঠেলে নিয়ে গেলো ওই অজানা দ্বীপে যেখানে বসবাস করছে হাই ইবনে ইয়াকজান। তের বছর আগে এমনি ঢেউ আর স্রোতের টানেই হাই বিন ইয়াকজানের দোলনা ভেসে এসে ভিড়েছিল এ দ্বীপে।

কিশতির নাবিক সালামান সমুদ্রের দুই প্রচন্ড ঢেউয়ের মাঝে সৃষ্ট নদীর খাড়ি থেকে কিশতিকে উদ্ধারের যত চেষ্টাই করুক না কেনো সবকিছু বিফল হলো। যখন সে কিশতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলো তখন কিশতি এসে ভিড়েছে এক অজানা উপকূলে।

সহযাত্রীরা সালামানকে বললো, "এখন এখানে যখন এসেই গেছি চলো ঘুরে ফিরে দেখি এ স্থানটি কোথায় ও কি আছে এখানে। হয়তো বা এখানে নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারি এবং আল্লাহর দুনিয়ার কিছু নয়া তথ্য নিয়ে যেতে পারবো।"

কিশতির মালিক ছিল দু'জন। সালামান ও আবসাল। সালামানের শ্যালক আরমানও ভগ্নিপতির সাথে সমুদ্র ভ্রমণে বের হয়েছিল। বাকী চারজনের তিনজন কিশতির মাল্লা এবং অন্যজন এক পৌঢ়া মহিলা। সে কিশতির বাবুর্চি। রান্নাবান্না ও



www.pathagar.com

অন্যান্য ছোটখাট কাজ করতো সে।

সবাই দ্বীপ দেখার জন্যে সম্মত হলো। কিশতিকে উপকূলে ভিড়িয়ে সাবধানে একে একে নেমে পড়লো দ্বীপে। তারা কিশতিটিকে একটি বড় পাথরের সাথে মোটা রশি দিয়ে বাঁধলো যাতে ভেসে না যায়। এরপর যে কোন অজানা বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষা করার মতো হাতিয়ার সাথে নিয়ে তারা পথ চলতে লাগলো।

এরা যখন গম ক্ষেতের কাছে এলো তখনি বুঝতে পারলো যে এখানে মানুষ বসবাস করে। কিন্তু কী ধরনের মানুষ? সবাই বললো, খুব সাবধান ও সতর্ক হতে হবে। হয়তো বা এ দ্বীপে মানুষ খেকো জংলী মানুষ থাকতে পারে। হয়তো বা ওরা আমাদের উপর আচমকা চড়ে বসবে এবং বিপদে ফেলবে।

আহা! বেচারা আদম সন্তান! ওরা কী জানে যে, কতো অসহায়ভাবে করুণ জীবন যাপন করে চলেছে এ দ্বীপের প্রথম মানুষটি!

যা হোক, যাত্রীরা অনেক ঘুরাঘুরি করলো। সবুজ-শ্যামল এ দ্বীপ দেখে এরা বেশ আনন্দিত। খুব উপভোগ করছে এরা দ্বীপের দৃশ্য ও ফলমূল। গাছ-গাছালী, ফল-ফুল, বন্য পশুপাখি, পোষ্য পশুপাখি সবই ওরা সেখানে দেখতে পেলো। কিন্তু মানুষের কোন ছায়া দেখতে পেলো না। অথচ গম ক্ষেতের অস্তিত্ব বলছিল যে, সেখানে মানুষ রয়েছে। অন্য কোন প্রাণী যে কৃষি কাজ জানে না। ঘাসখোর প্রাণীরা ঘাস পেলেই খায়, না পেলে উপোস করে। ওদের মাথায় তো ফসল বুনার বা ফসল বাড়ানোর বুদ্ধি ঢুকে না। এরা খুব ভাল করে ঘুরে বেড়ালো। সন্ধ্যে হয়ে এলে ফিরে এলো কিশতিতে। পরস্পর বলাবলি করলো ঃ "এ কথা ঠিক যে, এখানে আমাদের কোন কাজ নেই। তবু চলো এখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেই এবং এ দ্বীপটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে নেই।" তারা সমুদ্রের মানচিত্র বের করলো। কিন্তু কোথাও এ দ্বীপের কোন চিহ্ন বের করতে পারলো না। তাই এরা খুশী হলো যে, একটা নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করেই দেশে ফিরবে।

পরদিন ওরা দ্বীপের অন্য দিক দিয়ে হেঁটে চললো এবং বিস্ময়ের সাথে আদম সন্তানের ঘরের কাছে গিয়ে পৌঁছালো। দূর থেকেই যখন ওরা ঘর দেখতে পেলো তখনি সন্দেহ মুক্ত হলো যে, এ দ্বীপে নিশ্চয়ই মানুষ থাকে। তবে দ্বীপবাসী যদি বন্য হয়ে থাকে তবে তা হবে সমস্যার বিষয়। বন্য মানুষেরা মানুষের গোশত খায়। ওদের



www.pathagar.com

কাছে বিষমাখা তীর থাকে। ওরা কোন যুক্তি বুদ্ধি বুঝে সুঝে না। তখন যুদ্ধ ছাড়া গতি থাকে না।

যাত্রীদের একজন বললো, "চলো বাবা! ফিরে যাই। আর এগিয়ে লাভ নেই। আশঙ্কা হচ্ছে যে, নিজেরা মারা পড়বো অথবা কয়েকজন বন্য মানুষের খুন ঝরাতে হবে। কি দরকার এসব ঝামেলা ও অপরাধের!"

আরেকজন বললো ঃ আরে বাবা, এখনো তো কিছুই জানিনে। যদি অবস্থা বিপজ্জনক হয় তখন অবশ্যই পালাবো। কিশতিতো বেশী দূরে নয়, কাছেই। কিন্তু কিছুতো বুঝে যাওয়া উচিত। বোঝা-সোজার মাঝেই যে জীবনের মজা।

খুব সাবধানে এরা টিলা বেয়ে উপরে উঠলো এবং চারদিক পর্যবেক্ষণ করলো। নাহ্! আর কোন ঘরবাড়ি নেই। বুঝা গেলো যে, বন্য মানুষ থাকলেও সংখ্যায় এরা অনেক কম। এরা দূরবীন দিয়ে আদম সন্তানের ঘরটি ভালো করে পরখ করে নিলো। ওখানে গৃহপালিত ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, হাঁস-মোরগ ও কবুতর রয়েছে। এছাড়া ঘরের আশপাশ দেখে মনে হলো যে কেউ এখানে বসবাস করুক তার মাঝে কিছুটা রুচি ও সভ্যতাবোধ রয়েছে। মোটামুটি পরিপাটি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। তারা যতই বসে বসে অপেক্ষা করলো না কেনো ঘরে কোন মানুষের আনাগোনা দেখতে পেলো না।

প্রায় সন্ধ্যার সময় হাই বিন ইয়াকজান তার ভক্ত কুকুরটি নিয়ে জঙ্গল থেকে ফিরে আসছিল। যাত্রীরা দূরবীন দিয়ে এদের দেখতে পেলো। দূর থেকে মনে হলো বানরের মতো দু'পায়ে সোজা হয়ে কে যেনো থেকে থেকে হাঁটছে, সাথে কুকুর। নিঃসন্দেহে সে একজন মানুষ। যাত্রীরা টিলার উপরই অপেক্ষা করতে লাগলো। আদম সন্তান এসবের কিছুই না জেনে পৌঁছে গেলো তার ঘরের ভেতর। একটু পর সে ঘর থেকে বের হলো এবং পশুদের সামনে রাখা পানির পাত্রটির দিকে তাকালো। এরপর ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলো। অন্ধকার হয়ে এলে যাত্রীরা কিশতিতে ফিরে গেলো।

যাত্রীরা প্রত্যেকেই যার যার ধারণা মতো বক্তব্য রাখলো। একজন বললো, "আমার মনে হয় এখানে অনেক মানুষের বাস। ওরা বনে জঙ্গলে থাকে। শুধু একজনকে ওই ঘরে রেখেছে।"

আরেকজন বললো ঃ "এই একজনকে ওখানে রেখেছে কেনো? যেখানে


www.pathagar.com

কোনকালেই কোন কিশতি ভিড়ে না সেখানে কি ওরা চোর-ডাকাতের ভয় পাচ্ছে যে তাকে পাহারাদার রেখেছে?"

এ কথায় সবাই হেসে উঠলো।

অপর একজন বললো ঃ আমার মনে হয় এ দ্বীপের কোন মালিক রয়েছে যে, অন্য কোথাও বসবাস করে এবং প্রাণীটি তারই প্রতিনিধি। নিশ্চয়ই তার কাছে হাতিয়ার রয়েছে।

চতুর্থজন বললো ঃ আমার কী ধারণা জানো! আমার মনে হয় এ অল্প বয়েসী বালকটি কোন কিশতি থেকে লোকজনসহ দ্বীপে নামার পর জঙ্গলে হারিয়ে যায়। ফলে যাত্রীরা তাকে খুঁজে না পেয়ে ফেলে রেখেই চলে গেছে। কিংবা কোন ডুবে যাওয়া কিশতি থেকে নাজাত পেয়ে দ্বীপে গিয়ে উঠেছে এবং এ ধরনের এক নয়া জীবন শুরু করেছে।

আসলে কেউ সত্য ঘটনা জানতো না। পরদিন ভোরে তারা আবার গিয়ে উঠলো আগের টিলায় এবং দূরবীন দিয়ে ঘরটি দেখতে লাগলো। আদম সন্তান আগুন জ্বালিয়ে কিছু রান্না করে খাচ্ছিল। ধূয়া ও বাষ্প দেখে তাই মনে হচ্ছে। এরপর সে তার দুম্বাকে পানি দিলো। আর কোন সন্দেহ রইলো না যে, সে একজন বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানুষ। সে একাকী একটি সহজ সরল জীবনযাত্রা তৈরী করে নিয়েছে। তাঁর গায়ের পোশাক ছিলো হাস্যকর ধরনের। তার হাতের নখ, মাথার চুল ও অন্যান্য অবস্থা দেখে মনে হলো সে এক হতভাগা মানুষ।

যাত্রীরা বললো, "চলো, কাছে যাই। যদি সে বন্য ও বিপজ্জনকও হয় তবু তাকে কাবু করা কিছুই নয়।" তারা টিলা থেকে নেমে ঘরের নিকটবর্তী হতেই কুকুর অপরিচিতদের অস্তিত্ব টের পেলো এবং বিকট শব্দে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিলো। আদম সন্তান কুকুরের দৃষ্টি অনুসরণ করে যাত্রীদের দেখে ফেললো এবং দারুণ ভয় পেয়ে কুকুরসহ দৌড়ে জঙ্গলের দিকে পালালো। সে কখনো ধারণাও করতে পারেনি যে, এ দ্বীপে তারই চেহারার কারো দেখা পাবে। তার মনে হতে লাগলো ওরা বুঝি তার ঘরবাড়ি নিয়ে যেতে বা ধ্বংস করতে আসছে। তার ধারণা, ওরা হয়তো তারও ক্ষতি করতে পারে। তাই যখন সে দেখলো ওদের সংখ্যা বেশী এবং ওদের সাথে পারবে না তখনি পালালো। এতো বছর ধরে এ বন-জঙ্গলে তার কোন বড় ধরনের বিপদই



www.pathagar.com

হয়নি। এতোদিন সে তার মতো কোন প্রাণীই দেখেনি এখানে।

আদম সন্তান যখন পালিয়ে গেলো তখন স্বজাতীয় আদম সন্তানেরা তার ঘরের কাছে চলে এলো। তারা কাছে এসেই ডাক দিলো, "এখানে কে আছো?" কোন জবাব পেলো না। তারা নিশ্চিত হলো যে, একজন ব্যতীত আর কোন মানুষই নেই এ দ্বীপে। এরপর এরা ঘর তল্লাশী চালালো। তারা দেখতে পেলো, এটা কোন ঘরই নয়, বরং বাঁকা-তেড়া কোন গুহার মতো করে তৈরী করা হয়েছে। এতে রয়েছে কিছু ফল, সবজী এবং মাটির এবড়ো-থেবড়ো কিছু পাত্র। ঘরের মেঝেতে শুধু পা ফেলা ও বালকের শোবার জায়গা ছাড়া আর কোন খালি জায়গা ছিল না। ঘরের আসবাবপত্র ছিল খুবই সাদাসিধে ধরনের। যেনো হাজার বছর আগেকার গুহাবাসী মানুষের জীবন যাত্রার প্রতিচ্ছবি মিলছে এখানে। তবে সবকিছু থেকেই বুঝা যাচ্ছিল একজন সতর্ক ও বুদ্ধিমান কিন্তু অভিজ্ঞতাহীন ও শিক্ষা-দীক্ষা বিরত মানুষ এখানে বসবাস করছে। একজন ছাড়া যে এ দ্বীপে দ্বিতীয় কোন মানুষ নেই তাও নিশ্চিত হলো আসবাবপত্র দেখে।

একজন যাত্রী চিল্লিয়ে বললো ঃ "দেখো দেখো! কি চিত্র ও ছবি রয়েছে এখানে।" পর পর থরে থরে সাজিয়ে রাখা হালকা-পাতলা গড়নের পাথর খন্ডগুলোর গায়ে ছিল কুকুর ছাগল, ভেড়া, গাছ, কবুতর, মানুষের ছায়া, গমের শীষ, সূর্যমুখীর ফুলের চিত্র।

আরমান বললো ঃ পাথরগুলোকে পরপর এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে যেনো বইয়ের লাইব্রেরী। যাহোক, এ দ্বীপে আমরা এক শিল্পীর দেখা পেয়ে গেলাম। দেখো মাটির তৈরী এ কুকুরটি। একজন পাকা ওস্তাদের কাজ। কোন ভুল-ত্রুটি নেই কোথাও। ঠিক যেনো ওই পলাতক কুকুরটির প্রতিকৃতি।

সালামান বললো ঃ এখন বলো কী করে এ বন্য ও ভীতু মানুষটির সাথে পরিচিত হবো?

আবসাল ঃ আজ না হয় বাদ দাও! আমরা যে এলাম এটাই সে জানুক। চেষ্টা করবো তার সাথে কোন প্রকারে বন্ধুত্ব করতে।

একজন যাত্রী হাসিতে ফেটে পড়লো।

সালামান জিজ্ঞেস করলো ঃ হাসির কী পেলে?

হাস্যকার বললো ঃ এ জন্যে হাসছি যে, এ বন্য মানুষটি আমাদের দেখেই ভয়ে


www.pathagar.com

পালালো। সেখানে আবসাল বলছে দেখাশুনা না হতেই তার সাথে বন্ধুত্ব করবে। আমার মতে সে চেনা পরিচয়ের কিছুই বুঝে না। আমাদের উচিত হবে ওকে ধরার চেষ্টা চালানো।

আবসাল ঃ না, তা হয় না। আমরা জানিনে যে, সে কতটুকুন সভ্য বা বন্য! আমাদের উচিত তার মুখোমুখি হওয়ার আগেই তার কাছে বন্ধুত্বের প্রমাণ রাখা যাতে করে তার মনের ভয় কেটে যায় অথবা যুদ্ধবাজ হলে মৈত্রী করতে রাজী হয়।

একজন জিজ্ঞেস করলো ঃ কি করে তা করবে?

.আবসাল বললো ঃ স্নেহ মমতা, সদাচরণ ও উপকারের মাধ্যমে। দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ ও প্রাণী স্নেহ মমতার পিপাসু। যেমনি করে একটি বন্য প্রাণীকেও ভালবাসা ও শিক্ষার মাধ্যমে বশীভূত করা হয় তেমনি একেও আমরা বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে কাছে পেতে পারি। যদি ওকে আমরা ভয় দেখাই তাহলে এ কাজ আরো কঠিন হয়ে যাবে। তার সাথে জোর-জবরদস্তি ও লড়াই করতে গেলে বিপদ হতে পারে। কিন্তু ওকে যদি ভালবাসি, তার প্রয়োজন ও অভাবগুলো জেনে নেই, তার জীবন যাত্রার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি, তাকে আদর যত্ন করি তাহলে সেও আমাদের পছন্দ করবে, আমাদের কাছে ভিড়বে। আমরা তার সাথে কোন কথাবার্তা না বলে এখান থেকে চলে যেতে পারি বটে কিন্তু সে হয়তো আমাদেরকে, আমাদের মতো মানুষকে মনে-প্রাণে চায়। তার সে চাওয়া পাওয়া তাহলে কোনকালেই পূরণ হবে না। দুনিয়াতে স্নেহ-মায়া-মমতা এবং ভালো কাজ করার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই।

সালামান ঃ ঠিকই বলেছো। পছন্দনীয় কথাই বলেছো। মাশাআল্লাহ, বারেকাল্লাহ! আবসাল! আমি তোমার মতোই ভাবছি। চলো এখন তাড়াতাড়ি করা যাক। আজকের কাজ কালকের জন্যে পিছিয়ে রাখা ঠিক নয়। আমরাতো আর সব সময় এখানে থাকতে পারবো না।

আবসাল ঃ চলো শুরু করি। সে তার ঘরে ফিরে আসার আগেই চলো তার ঘরটিকে পরিপাটি, গোছগাছ ও পরিষ্কার করে ফেলি। এখানে তার যা কিছু রয়েছে তার চেয়ে আরো ভাল ভাল জিনিস এনে দেই তাকে। যে মানুষ এতো সুন্দর করে চিত্র আঁকতে পারে সে যদিও শিশুকাল থেকেই এ বন্য পরিবেশে যে কোন কারণে মানুষ হয় এবং সমাজ জীবন দেখে না থাকে তথাপিও ভাল ভাল আসবাবপত্র, সুস্বাদু



www.pathagar.com

খাবার-দাবার এবং আমাদের সদাচরণকে ঠিকই বুঝতে পারবে, তারতম্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

দুপুরের ভেতরই আদম সন্তানের ঘরটি মানুষের বসবাসের মতো সুন্দর ও পরিপাটি হয়ে গেলো। এখন অনায়াসে এর ভেতর চলাচল ও বিশ্রাম নেয়া যায়। তার বিছানার স্থানে নরম লেপ-তোষক ও বালিশ দেয়া হলো। ঘরের এক কোণায় ভাল ভাল থালা বাসন ও হাঁড়ি-পাতিল এবং নানা রকমের মজার মজার খাবার-দাবার রাখা হলো। কিশতি থেকে একটি কাঠের বাক্স আনা হলো। এর ভেতর ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দ্রব্য সামগ্রী গুছিয়ে রাখা হলো। কয়েকটি চামড়ার ও কাপড়ের জামা, পায়জামা ও হাফ প্যান্ট দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। কিছু মিষ্টি রুটি, বিস্কুট, শুকনো রুটি, তেলে ভাজা আলুর চিপস্ এবং অন্যান্য সামগ্রী কিশতি থেকে আনা হলো। একটি বড় আয়না ঝুলানো হলো দরজার বাইরে দেয়ালে। কয়েকটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হলো ঘরের ভেতর ও বাইরে। এরপর তারা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। সালামান বললো ঃ "এবার সে আমাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে বলে আশা করা যায়।"

একজন সঙ্গী হঠাৎ হেসে উঠলো।

সালামান বললো ঃ এতে আবার হাসির কী পেলে?

হাস্যকার বললো ঃ আসলে আমি বলতে চাচ্ছি চলো তাকে একটি চিঠিও লিখে যাই। চিঠিতে তার সাথে কিছু কথাবার্তা বলি। তাহলে আমাদের পরিচয় তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে।"

আবসাল ঃ মাশাআল্লাহ! ধন্যবাদ তোমায়। দেখা যাচ্ছে মাথায় কিছু ঘিলু আছে তোমার। এ এক উত্তম প্রস্তাব। আমার মাথায় এ চিন্তা ঢুকেনি। মাশাআল্লাহ! এখন থেকে না হেসে ও ঠাট্টা-মস্করা না করে এ ধরনের কিছু ভাল জিনিস চিন্তা-ভাবনা করো। ঠিকই বলেছো একটি চিঠি দূরকে কাছে টেনে আনে।

তারা একটি বড় কাগজ দেয়ালে সেঁটে তাতে বড় বড় হরফে আদম সন্তানের কাছে চিঠি লিখলো। চিঠির মর্মার্থ এই ঃ

"প্রিয় বন্ধু! তুমি আমাদের চেনো না। আমরাও তোমাকে চিনি না। আমরা তিন দিন হলো কিশতিযোগে এ দ্বীপে এসেছি। আগামীকাল চলে যাবো। এ দ্বীপে তোমাকে ছাড়া আর কোন মানুষ দেখিনি। আজ আমরা বুঝতে পারলাম যে, তুমি



www.pathagar.com

আমাদের আগমনে বিরক্ত হয়েছো। কিন্তু আমরা তোমার অনিষ্ট করতে চাই না। তুমি যদি আমাদের সাথে পরিচিত হতে না চাও তাহলে আমরা জোর করবো না। আমরা মনে করেছি তুমি আমাদেরই স্বজাতি এবং আমাদের সাথে পরিচিত হলে তোমার উপকারও হতে পারে। যদি তুমি আমাদের সাথে শহরে যেতে চাও আমরা তোমায় নিতে রাজী। যদি তা না চাও তবে তোমার যা কিছু প্রয়োজন তা তোমাকে আমরা দিয়ে যেতে পারবো। তুমি যদি কারো কাছে কোন সংবাদ পাঠাতে চাও আমরা তা বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তুমি এখানে বহু কষ্টে রয়েছো। তোমার যে জ্ঞান-বুদ্ধি দেখতে পেয়েছি তাতে তুমি ভবিষ্যতে অনেক সুখী ও ভাগ্যবান হতে পারো। যা হোক, যদি আমরা তোমার কোন উপকার করতে পারি তাহলে তোমার পছন্দ মতো আমরা তা করতে তৈরী। আমরা তোমার কাছ থেকে কিছুই চাইনে। আমরা এই দূর-দুরান্তের অজ্ঞাত দ্বীপে একজন মানুষকে দেখে তাজ্জব হয়েছি। তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারলে আমরা খুব খুশী হবো। সম্ভব হলে এ পত্রের জবাব লিখো কিংবা আগামীকাল ঘরে অপেক্ষা করো। আমরা আসবো। তোমার সাথে আলাপ-পরিচয় করবো। তোমার কী কী প্রয়োজন তখনই জানা যাবে। তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিত থেকো যে, আমরা তোমারই শুভাকাংখী বন্ধু।

ইতি

**সালামান ও আবসাল**

কিশতির দুই মালিক।"

তারা কাগজের নিচের দিকে কয়েকটি মানুষ ও পশুর ছবি এঁকে দিলো।

হাস্যরসিক ব্যক্তি বললো ঃ আরেকটি প্রস্তাব রাখতে চাই।

সবাই বললো ঃ বলো।

সে বললো ঃ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ লোক লেখাপড়া নাও জানতে পারে।

– কালই জানা যাবে।

– সম্ভবতঃ তার ভাষা অন্য কিছু হতে পারে। আমার মতে কয়েক ভাষায় চিঠিটি লেখো।

আবসাল ঃ ধন্যবাদ! খুব ভাল প্রস্তাব। সবার ভাষা যেখানে এক নয় সেখানে অনুবাদই সহজে মানুষকে কাছে নিয়ে আসে।



www.pathagar.com

সালামান ও আবসাল প্রত্যেকেই কয়েকটি ভাষা জানতো। অন্যরাও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিখেছিল। তাই সবাই মিলে শিগগিরই এগারোটি ভাষায় চিঠিটি লিখলো। সবগুলো চিঠিই দেয়ালে পাশাপাশি ঝোলানো হলো। এসব কাজ করতে করতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। তারা সবাই টিলায় গিয়ে লুকিয়ে রইলো এবং দূরবীন হাতে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সন্ধ্যার দিকে আদম সন্তান তার কুকুরের সাথে ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগলো। তার হাতে তীর ও ধনুক। কুকুর মনিবের আগে আগে পথ চলছে। ঘরের কাছাকাছি এসেই বুঝলো যে, বিদেশী লোকেদের কেউ নেই। তবে সে ঘরে ঢুকেই এক নজরে সবকিছু দেখে ভয় পেয়ে গেলো। প্রদীপের আলো এবং ঘরের এতোসব পরিবর্তন দেখে সে ভ্যাবাচেকা খেয়ে ভড়কে গেলো। কিন্তু তার কুকুরটি ঘরে ঢুকে এরপর বাইরে এলো। সেও কয়েকবার বাইরে এলো ও ভেতরে গেলো এবং ঘরের চারপাশ পরখ করে দেখলো। যখন নিশ্চিত হলো যে, কেউ নেই তখন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো।

ওদিকে টিলার উপর রসিক ব্যক্তিটি বললো ঃ চলো যাই। গিয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা যাক কী করছে।

সালামান বাধা দিয়ে বললো ঃ না, এ কাজ ঠিক হবে না। কুকুর সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যাবে এবং ঘেউ ঘেউ করে মনিবকে জানাবে। তখন সে ভয় পেয়ে যাবে এবং আমাদের সব কষ্টই পন্ড হয়ে যাবে। তাকে বরং স্বাধীন ও আরামে থাকতে দাও। তাড়াহুড়ার কোন প্রয়োজন নেই। আগামীকাল সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সঙ্গীরা বললো ঃ সালামান ঠিকই বলেছে। চলো এখন কিশতিতে ফিরে যাই।

এদিকে আদম সন্তান ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তার সবকিছুতেই পরিবর্তন এসেছে। ভয়ের তেমন কিছুই দেখলো না। প্রদীপটি ঘরের ভেতর কতো সুন্দর আলো ছড়াচ্ছে। বাইরেও এখন আলোকিত। সে মনে মনে ভাবলো ঃ "সকালে যাদের দেখেছি এরাই নিশ্চয় এসব জিনিসপত্র এনেছে। এদের কোন খারাপ উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে হয় না।" সে প্রথম যে বিষয়টি পরখ করে দেখলো তা হচ্ছে তার বিছানা। প্রথমে পা দিয়ে নেড়ে দেখলো। না, খারাপ কিছু নয়। তুলা দিয়ে তৈরী তার কম্বল থেকে অনেক ভাল। লেপ নেড়ে চেড়ে



www.pathagar.com

ভাবলো, "ওরা আমার চেয়ে অনেক ভাল কিছু বানিয়েছে।" এরপর একের পর এক থালা-বাসন ও হাঁড়ি-পাতিল এবং খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষা করা শুরু করলো। খাবারগুলো বেশ মজা ও সুস্বাদু। অতঃপর সে কাপড় চোপড় দেখে ভাবলো, এসব তো আমারই গায়ে দেয়ার মতো কিছু। জামায় আস্তিনও আছে। চামড়ার পোশাক নেড়ে চেড়ে সে ভেবে পেল না এগুলো কি ধরনের পশুর চামড়া। সে ভাবলো হয়তো এগুলো পশম ও তুলার মতো কিছু দিয়ে তৈরী করেছে। একটি সে গায়ে চড়ালো। আস্তিন ঝুলে ছিল। তাই আস্তিনের ভেতর হাত ঢুকানোর চেষ্টা করলো। খুব কষ্ট হচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত যখন পড়লো তখন মনে হলো সে-ও যেনো ওই অপরিচিত লোকদেরই মতো হয়ে গেছে। আদম সন্তান এরপর ঘরের বাইরে দেয়ালে আটকানো কাগজগুলো দেখলো। সেগুলোর গায়ে হাত বুলালো। একটিকে ছিঁড়ে এর গায়ে লেখাগুলোর প্রতি তাকালো। কিন্তু কিছুই বুঝলো না। সে কাগজটি মুখে দিয়ে চিবাতে চাইলো। কিন্তু খুবই বে-মজা ও নিরস। ফেলে দিলো থুথুর সাথে। এরপর আরেকটি কাগজের প্রতি তাকালো। কাগজের নিচে আঁকা চিত্রের প্রতি নজর গেলো। সে চিনতে পারলো। এটা ভ্যা ভ্যা অর্থাৎ ছাগল, এটা বাকবাকুম অর্থাৎ কবুতর, ওটা ঘেউ ঘেউ অর্থাৎ কুকুর! আর এটা যে তার নিজের চেহারা!

সে পশুদেরকে এদের ডাক ও শব্দ অনুসারে চিনতো। কিন্তু গাছগাছড়ার শব্দ ছিল না বলে সে নিজ থেকে কোন নামও দিতে পারতো না। কাগজে অঙ্কিত চিত্রগুলো তার আঁকা চিত্রসমূহ থেকে অনেক ভাল ছিল। সে মনে মনে ভাবতে লাগলো ঃ "তাহলে সকালে যারা এসেছিল এরা আমারই মতো প্রাণী। ওরা আমার কথা বুঝে এবং আমাকে চিনতে সক্ষম। ওরাই আমার জন্য খাবার এনেছে। ওরা আমাকে আদর করতে চায়।"

আদম সন্তান এসব কথা যখন ভাবছিলো তখন তার চোখে তাপ অনুভব করলো। এরপর ছলছল করে তার অজান্তেই চোখ থেকে গাল বেয়ে কান্নার ধারা বইতে লাগলো। অনেকক্ষণ পর সে ভাবলো ঃ "হ্যাঁ, পেয়ে গেছি! এরাই তাহলে আমার মা, এরাই আমার জাতি, এদের থেকেই আমার জন্ম। আহ্! এরা কতই না ভালো। এতো দিন কেনো এলো না। এখন কোথায় চলে গেলো। এদের আর আমি ভয় করি না।" ভাবতে ভাবতে তার সারা চেহারা উত্তেজনা ও আনন্দে গরম হয়ে উঠলো। তার মনে এখন নয়া অনুভূতি, নয়া চেতনা এসেছে। সে এখন আর কাউকে ভয় করে না।


www.pathagar.com

এরপর সে ঘরের দরজা খুললো, দূরে বেশ অন্ধকার ছিল। অন্ধকারকে তার সব সময়ই ভয় লাগে। না, এখন আর সে অন্ধকারকেও ভয় পায় না। বাইরে এগিয়ে গিয়ে গলা ফাটিয়ে বললো ঃ "হৈ! হৈ! হৈ!" একবার, দু'বার, তিনবার এ ধরনের শব্দ করলো। আর আওয়াজ দূরে টিলায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। দূর থেকে একটি পশুর কণ্ঠ শুনা গেলো। আদম সন্তানের মনে ভয় ঢুকে গেলো। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করলো এবং ভাবলো ঃ "এ আওয়াজতো ওদের নয়, ওদের আওয়াজ এরকম নয়। এ কণ্ঠ কার তাকে চিনি।" এরপর সে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লো।

ওদিকে কিশতির যাত্রীরা ভোরে এক সাথে চলে এলো সেই টিলার উপর। তারা দূরবীন দিয়ে প্রথমেই পরিস্থিতি যাচাই করে নিলো। এরপর ধীরে ধীরে এগুতে থাকলো ঘরের দিকে। ইতোমধ্যে আদম সন্তানও ঘরের বাইরে এসেছে। তার গায়ে একটি চামড়ার জামা এবং ঠোঁটে আনন্দের হাসি। কিশতির আরোহীরা তার অবস্থা লক্ষ্য করে বললো ঃ "আমাদের উপহার সে গ্রহণ করেছে এবং আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।" ওরা দূর থেকে হাত নেড়ে তাকে সালাম জানালো। আদম সন্তান তার তীর-ধনুক প্রস্তুত করলো এবং ওদের মতোই হাত তুলে নাড়লো। সে হাত নাড়ানোর অর্থ কিছুই বুঝতে পারছিল না। ওরা যখন আরো কাছে এলো তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিলো। ঘেউ ঘেউ অর্থাৎ বিপদ সংকেত। আদম সন্তান আবারো ভয় পেয়ে গেলো। তাই কুকুরসহ দৌড়ে পালালো জঙ্গলের দিকে।

সালামান জোর গলায় ডেকে বললো ঃ "হেই! শুনো? দাঁড়াও, ভয় পেয়ো না। আমরা তোমার বন্ধু, শত্রু নই।" অন্যরাও একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো। কয়েক ভাষায় তারা বললো। কিন্তু আদম সন্তান কিছুই বুঝলো না। শুধু 'হেই' শব্দটুকুন বুঝলো যা তারই "হৈ হৈ" শব্দের মতো। সে একটু দাঁড়িয়ে ওদের দেখলো। ওরা হাত নেড়ে তাকে ডাকছে। সে ভাবলো ঃ "আমি তো ওদের দিকে তীর মারিনি। তাহলে ওদের হাতে কেনো ব্যথা করছে।" এরপর সে পুনরায় কুকুর নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো বনের ভেতর।

আবসাল বললো ঃ "আমার মনে হয় এ লোক ভাষা জানে না, কথা বলতে পারে না।"



www.pathagar.com

সালামান বললো ঃ "কেনো জানে না! আমাদের হাস্যকারের ধারণা মতে সে তো এমন দেশের লোক যার ভাষা আমাদের থেকে আলাদা!"

ইবনে ইয়াকজান বললো ঃ "এখন চলো তার ঘরে গিয়ে দেখি সেখানে কী অবস্থা। ওখানে গেলে বহু কিছু বুঝা যাবে।"

সবাই এসে ঘর তল্লাশী করলো। খাদ্য সামগ্রী ও মিষ্টি দ্রব্যের কিছু কিছু সে খেয়েছে। লেখা কাগজগুলো এখানো দেয়ালে আঁটা। একটি ছিঁড়ে গেছে। হাস্যকার বললো ঃ "আমার ধারণা সে শুধু একটি ভাষা জানে।"

আবসাল বললো ঃ "তাহলে জবাব দিলো না কেনো?"

সালামান চিবিয়ে দুমড়ো মোচড়ো করা কাগজ টুকরা খুঁজে পেলো এবং বললো ঃ "আর তার ভাষা হচ্ছে এই- শুধু খাওয়া। সে কাগজগুলোকেও খাদ্যবস্তু মনে করেছিল। আসলে বুঝা যাচ্ছে, সে নিরক্ষর। কোন ভাষাই বুঝে না। বরঞ্চ সে সম্পূর্ণ বন্য মানুষ। সম্ভবতঃ শিশুকাল থেকেই একাকী বড় হয়েছে এবং সারা জীবনে কোন মানুষ দেখেনি।"

আবসাল বললো ঃ "তাহলে এখানে যা কিছু দেখছি সবই সে নিজেই আবিষ্কার করেছে।"

সালামান বললো ঃ বিস্ময়ের কিছুই নেই। আদম সন্তান যখন তখন নিশ্চয়ই কিছু না কিছু বুঝতে পারবেই। প্রাচীনকালে মানব সমাজতো এভাবেই একের পর এক দ্রব্য সামগ্রী ও হাতিয়ার তৈরী করেছিল। এখানেই আমরা সেই আদিম মানুষের এক নমুনা দেখতে পাচ্ছি।"

রসিকজন বললো ঃ "তাহলে চিত্রাঙ্কন তাকে কে শেখালো?"

সালামান বললো ঃ "চিত্র সে নিজে নিজেই পশুপাখি ও বস্তু সামগ্রী দেখে দেখে শিখেছে। কিন্তু ভাষা ও লেখনী এমন এক আবিষ্কার যার জন্যে সামাজিক জীবন প্রয়োজন। একা মানুষের জন্যে ভাষা ও লেখার প্রয়োজন নেই। আর প্রয়োজন না হলে কেউ আবিষ্কারও করে না। কোন শিশু যখন কারো আওয়াজ শুনে না তখন সে কথা বলাও শিখতে পারে না। যেমন যে ব্যক্তি বোবা সে নিশ্চয়ই বধির।"

সবাই সালামানের বক্তব্য মেনে নিলো। সালামান আবারো বললো ঃ "অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এ দ্বীপে এ বালক নিজেও নিজেকে চিনে না। কথা বলাও হয়তো জানে না



www.pathagar.com

কিংবা ভুলে গেছে। সুতরাং ....”

রসিক লোকটি বললো ঃ “সুতরাং আমার কথাই ঠিক! ওকে অবশ্যই বন্দী করতে হবে এবং প্রথম থেকে সব কিছু শেখাতে হবে। যে ব্যক্তি নিজে নিজেই চিত্র অঙ্কন, হাঁড়ি-পাতিল বানানো, কম্বল তৈরী ও চামড়ার পোশাক তৈরী করতে পেরেছে সে নিশ্চয়ই অনেক সম্ভাবনা ও প্রতিভার অধিকারী। সে অবশ্যই কথা বলা ও লেখাপড়া শেখা অন্যদের তুলনায় দ্রুত আয়ত্ব করতে পারবে। তাই চিঠিপত্র লেখা ও পরিচিতি বলায় কোন ফায়দা নেই।”

একজন বললো ঃ “বাদ দাও তো বাবা! আমাদের কী! চলো নিজেদের কাজে ফিরে যাই। আমরা এখন নিজেরাই জানিনে যে কোথায় আছি এবং নিজেদের শহরে ফিরে যেতে পারবো কী না।”

চাবুর্চী মহিলাটি এবার মুখ খুললো। সে বললো ঃ “না, একথা মোটেও বলো না। কী করে মানুষ এমন এক অজানা দ্বীপে এমন একটি অসহায় ছেলেকে দেখেও ফেলে যেতে পারে? যে কোনভাবে আমরা ওকে নাজাত দেবো। মানুষের উচিত নয় এমন নির্দয় নিষ্ঠুর হওয়া। এমন কথা মনুষ্যত্বের পরিচয় নয়। আমি ওকে ছাড়া মোটেও যাবো না।”

সেই নির্দয় লোকটি বললো ঃ “বাবা! তুমি যে অনেক ভালো মানুষ তা জানি। তুমি তোমার নিজের বাচ্চাদের বড় কর গিয়ে। ওদের শিক্ষা দিলেই তোমার চৌদ্দ পুরুষের উপকার হবে।”

অন্যরা বললো ঃ “না, এমন কথা বলা উচিত হবে না। এ ছেলেটির জায়গায় তুমি নিজেকে মনে করো। কেউ কি তোমায় দেখলে তোমাকে উদ্ধার করার চিন্তা করবে না? আমরা সবাই মানুষ, সবাই আদম সন্তান। মানুষের বাচ্চাও মানুষ। হয়তো এ ছেলেও একদিন অনেক বড় হবে। কে জানে কার ভাগ্যে কী আছে। তুমি যদি বাচ্চা বয়েসে এই দ্বীপে একাকী এসে পড়তে তাহলে কী এমনভাবে মাটির বাসনপত্র বানাতে পারতে? এমন সুন্দর করে ছবি আঁকতে পারতে? হয়তো বা এ ছেলেই ভবিষ্যতে শত শত জিনিস আবিষ্কার করবে আর বিশ্বের মানুষ সে সব কাজে লাগিয়ে উপকার পাবে। এ জন্যেই বলা হয়, যে ব্যক্তি একজন মানুষকেও ধ্বংস থেকে বাঁচাবে সে যেনো সমগ্র মানব জাতিকেই বাঁচালো।”



www.pathagar.com

নিষ্ঠুর লোকটি বললো ঃ "আমি আমার কথা উঠিয়ে নিলাম। আমি ভুল করেছি। আসলে এ বাচ্চাটির জন্যে আমারও মন কাঁদছে। আমারও তো ছেলেমেয়ে আছে। যে কোনভাবেই হোক না কেনো আমরা তাকে এ দুর্ভাগ্য থেকে নাজাত দেবো।"

আবসাল বললো ঃ "আমরা প্রথম থেকেই এরকম ভেবে এসেছি। এছাড়া ভাবনার অন্য কী আছে?"

সালামান বললো ঃ "এ নিয়তের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁকে ধরার জন্যে এমন বুদ্ধি ও ফন্দী বের করতে হবে যাতে সে ভয় না পায় এবং আহত ও অসুস্থ না হয়ে পড়ে।"

এরপর তারা আবারো ঘরে খাবার-দাবার ও প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে গেলো। তারা ঠিক করলো রাতেই ফিরে আসবে ও ছেলেটিকে ধরে ফেলবে।

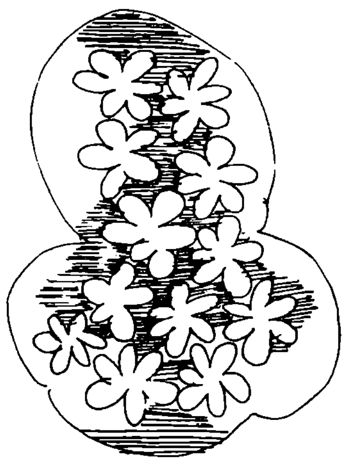



www.pathagar.com

# আদম সন্তান, ভাষা ও সংস্কৃতি

এ আদম সন্তান যদি ভাষা এবং লেখাপড়া জানতো তাহলে তো তার কাজও সহজ হতো এবং যারা তাকে সাহায্য করতে চাচ্ছে তাদের পক্ষেও সুবিধা হতো। কিন্তু সে এখন ভয় পায়। তাকে কথা বলে কিছুই বুঝানো যাচ্ছে না। কিশতির আরোহীরাও আর বেশীদিন এ অজানা দ্বীপে থাকতে চাচ্ছে না। তাই তারা বাধ্য হলো বিশেষ চাতুর্যের মাধ্যমে তাকে বন্দী করতে যাতে তার জন্য কোন বিপদাশঙ্কা থাকবে না।

সেই নিষ্ঠুর লোকটি বললো ঃ "এখন বলো কীভাবে তাকে ধরা যায় যাতে তার কুকুরটিও আহত না হয়।"

রসিক লোকটি বললো ঃ "এটা কোন ব্যাপারই নয়। যেভাবে মাছ ও হাঁস ধরা হয় সেভাবেই ওকে জাল দিয়ে ধরবো।"

তার কথায় সবাই হেসে উঠলো। আসলে প্রস্তাবটি মন্দ ছিল না।

তারা জানতো যে, ছেলেটির ঘরে সে এবং তার কুকুর ছাড়া আর কেউ বসবাস করে না। সবাই মিলে সে রাতেই তাদের মাছ ধরার বড় জাল সাথে করে চলে এলো ঐ ঘরের কাছে। ছেলেটি তখন গভীর ঘুমে। তারা নিঃশব্দে ঘরের দরজায় ভাল করে জালটি ছড়িয়ে দিলো। দরজার দু'পাশে চারজন জালের কেনার ধরে দাঁড়ালো। জালের ভেতর দরজা থেকে সামান্য দূরে কয়েক টুকরা গোশত ফেলে রাখলো। অন্য দু'জন পাহারা দানে তৈরী রইলো। মহিলাকে বলা হলো সে যেনো ঘরের পেছনে গিয়ে কয়েকবার সজোরে মাটির উপর পা ফেলে এবং কয়েকবার ছাগলের ভ্যা ভ্যা ডাক ছাড়ে।

মহিলার এসব সাড়া শব্দে কুকুরের টনক নড়লো এবং শুরু করলো ঘেউ ঘেউ। আদম সন্তানের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সে ভাবলো তার ছাগলের উপর কোন হিংস্র প্রাণী হামলা করেছে। সে সতর্কতার সাথে দরজার কপাট খুললো এবং হাতে গাছের একটি ডাল নিলো। দরজা ফাঁক পেয়েই তার কুকুরটি বেরিয়ে পড়লো। কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করেই গোশত দেখে নীরব হয়ে খাওয়া শুরু করলো। ব্যস তখনি কুকুরটিকে জাল দিয়ে পেচিয়ে আটক করা হলো। আর কোন বিপদ রইলো না। তীর ধনুক দিয়ে ছেলেটি এতো কাছ থেকে কিছুই করতে পারবে না। এখন তাকে ধরা কঠিন কিছু



www.pathagar.com

নয়। এদিকে ছেলেটি যখন দেখলো তার কুকুর নীরব রয়েছে তখন ভাবলো বিপদ কেটে গেছে। সে পা বাড়ালো ঘরের বাইরে। তখন দরজার দু'পাশ থেকে দু'জন তার বাহু শক্ত করে ধরে ফেললো এবং বললো ঃ "ভয় পেয়ো না! আমরা তোমার বন্ধু।"

ছেলেটি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। রসিক লোকটি এবার হাসিতে ফেটে পড়লো। সবাই এখন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। হাসির আওয়াজ ছেলেটির কাছে পরিচিত মনে হলো। তারই হাসির মতো এ হাসি। একটু সান্ত্বনা পেলো। কিন্তু এরপরও তার অনেক ভয় হচ্ছে। বাবুর্চি মহিলা সে সময় একটি হারিকেন নিয়ে কাছে এলো। একেকজন একেক কথা বলছে। তবে খুব শান্তভাবে বলার চেষ্টা করছে। তারা জিজ্ঞেস করছে ঃ

"এখানে তুমি কী একা আছো? কবে থেকে এখানে আছো? আমরা তোমায় দেখে অনেক খুশী হয়েছি। আমরা তোমারই বন্ধু। তুমি মোটেও ভয় পেয়ো না।" ইত্যাদি। এসব কথা তারা বিভিন্ন ভাষায় বললো।

আদম সন্তান এসব কোন কথা ও ভাষার অর্থই বুঝতে ছিল না। তবে এসব কথা থেকে সে স্নেহ মায়ার পরশ পাচ্ছিল। কথাগুলো ছিল বেশ অমায়িক, শান্ত ও আদরের। এসবে কোন ধমক, হুমকি, ভয় বা শত্রুতার নিদর্শন ছিল না। তাদের গায়ের পোশাকগুলো ছিলো তাকে দেয়া পোশাকগুলোরই মতো। কিন্তু হঠাৎ এভাবে রাতের গভীরে এরকম অবস্থা হবে সে তা কল্পনাও করতে পারেনি। যখন সে সতর্ক হলো তখনই তার মনে ভয় ঢুকে গেলো। সে ওদের হাত থেকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু সম্ভব ছিল না। সে তখন তার জানা শব্দগুলো জোরে সোরে উচ্চারণ শুরু করলো। এসবে ঝাঁজ ছিল, রাগ ছিল এবং হুমকি ও শত্রুতার চিহ্ন ছিল। সবাই তখন বুঝলো যে সে পশুপাখির ভাষা ছাড়া আর কিছুই জানে না। কারো কারো মন মমতায় কেঁদে উঠলো, দুঃখ আফসোসে মাথা নুয়ে এলো। মহিলাটি এসব দেখে চোখের পানি মুছছিল। কারো ঠোঁটে ছিল মৃদু হাসি। কেউ আর কথা বলছে না। কথা বলে লাভ কি?

হঠাৎ মহিলাটি দৌড়ে গিয়ে ব্যাগ থেকে মিষ্টি পিঠা বের করে নিয়ে এলো এবং সবার সামনে রাখলো। মহিলা অবস্থা বুঝে প্রথমে নিজেই একটা মুখে দিয়ে খেলো যাতে আদম সন্তান তা নিজ চোখে দেখে। একটি সালামানের মুখে গুঁজে দিল। আরেকটি গুঁজে দিল বালকটির বাহু ধরে রাখা আবসালের মুখে। ওরা মজা করে



www.pathagar.com

খেলো। এরপর সে একটি পিঠা তুলে দিলো ছেলেটির মুখে। কিন্তু সে খেলো না, বরং থুথুর সাথে ফেলে দিলো দূরে। তার মনে দারুণ বিরক্তি, উত্তেজনা এবং ভয়। তার মনে পড়লো সে এভাবেই কবুতরগুলোকে শিকার করতো। সুতরাং খাদ্য ও দানা দেয়ার অর্থ সব সময় ভালবাসা ও আদর নয়। যদি তার হাত ছেড়ে দিতো তাহলে সে পালিয়ে বাঁচতে পারতো। কিন্তু ওদের শক্তি যে অনেক বেশী। যখন দেখলো উপায় নেই তখন আর চেষ্টা করলো না, শান্ত ও ক্ষান্ত হলো। সে সবার কাপড়-চোপড় তীর্যক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। ওদের চেহারাগুলোর প্রতি ভাল করে তাকালো। সবাই যে তারই মতো। এসব চেহারা সে কেবল আয়না ও পানিতেই দেখেছে। অর্থাৎ তার নিজের ছবিই দেখেছে। তাদের চেহারায় পশম নেই, ওদের লেজও নেই, শিং-ও নেই। তবে ওদের খুর আছে! ওদের সবকিছু যে আমার মতো নয়। ওদের পায়ে কেনো খুর দেখা যাচ্ছে? সে ভাল করে ওদের জুতাগুলো দেখছিল।

হাস্যরসিক লোকটি এবার হাসিতে ফেটে পড়লো এবং বললো ঃ "আমার মনে হয় সে আমাদের জুতা দেখে ভয় পাচ্ছে এবং মনে করছে আমাদের পায়ে খুর আছে।" এরপর সে তাড়াতাড়ি নিজ পা থেকে জুতা ও মোজা খুলে ফেললো এবং বললো ঃ "নাও! এগুলো তুমি পড়।" কিন্তু না, সে পড়লো না।

সবাই তখন নিশ্চিত হলো যে, তারা এমন এক মানুষের সম্মুখীন যার ভাষা জ্ঞান কিছুই হয়নি। সুতরাং তার সাথে এখন বোবাদের ভাষায় তথা চিরন্তন 'আন্তর্জাতিক' ভাষায় কথা বলতে ও তাকে শেখাতে হবে। এদিকে কুকুরটি গোশত খেয়ে শান্ত হয়ে সবার দিকে তাকানোতে বন্য ছেলেটি ভাবলো ঃ "এরা নিশ্চয় বিপজ্জনক নয়।" কারণ কুকুর বিপদ থাকলে নিশ্চয়ই ঘেউ ঘেউ করে জানাতো। এখন তার প্রিয় কুকুরটি সামনে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

এবার সবাই তাকে নিয়ে ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো এবং তাকে ঘিরে বসলো। সেও ভীতু মনে বসতে বাধ্য হলো। তার বাহু এখনো দু'জনের মুঠোর মাঝে ধরা। এবার মহিলা খাবারের পাত্র এনে রাখলো সামনে। সালামান বললো ঃ "ধন্যবাদ তোমাকে! তার মন থেকে ভয় দূর করার এরচে বড় পথ আর নেই। প্রথমে নিজেই পিঠা খেয়ে দেখিয়েছো এরপর আমাদের মুখে গুঁজে দিয়েছো। আবারো শুরু করো।" সবাই তখন একে একে রসালো মিষ্টি পিঠা খাওয়া শুরু করলো। হাস্যরসিক লোকটি বললো ঃ "এবার আমি আমার বাচ্চাটিকে পিঠা খাওয়াবো।" সে হাসতে হাসতে



www.pathagar.com

একটি পিঠা গুঁজে দিলো ছেলেটির মুখে। না, এবারও খেলো না। বরং লোকটির মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তার হাসিই সে বেশ অনুসরণ করতে ছিল। কেননা সে হাসির অর্থ বুঝতে পারছিল। সেও যে এরকমই হাসতে পারে! এ হাসি যে তারই হাসির মতো। এ কথা ভাবতেই এক সময় সে ফিক করে হেসে দিলো।

আরমান বললো ঃ "এখন সে আমাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যাচ্ছে। মনে হয় সে এবার নিজ হাতেই পিঠা খাবে।" তার ডান হাতটি তখন ছেড়ে দেয়া হলো। একজন পিঠার পাত্রটি এগিয়ে দিলো তার সামনে। সে অনেকক্ষণ ভাবলো এবং পিঠাগুলোর দিকে তাকালো। একই জিনিস সে গতকালও খেয়েছে। সে জানতো যে, এ খাবার বেশ মজা। শেষ পর্যন্ত একটি সে তুলে নিয়ে মুখে দিলো আরেকটি গুঁজে দিলো রসিক লোকটির মুখে। রসিক লোক লাফিয়ে উঠে ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো ঃ "অনেক ধন্যবাদ! আল্লাহ তোকে বাঁচিয়ে রাখুক বাবা! তোর হাতে পিঠা আরো মজা লাগছে।"

তার শেষের কথায় সবাই হেসে উঠলো। এতোক্ষণে আদম সন্তান স্বাভাবিক হলো। তাদের সাথে আপন হলো। তার মনে আর কোন রাগ নেই। এবার সবাই মজা করে মহিলার হাতে তৈরী পিঠা খেতে লাগলো। রসিক লোকটি মজা করতে চাইলো। সে পশুদের মতো চার হাত পায়ে ভর করে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে কয়েকবার বললো ঃ "ভ্যা ভ্যা" এবং কয়েকবার বললো ঃ "মিঁউ মিঁউ!" এরপর সে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মুখ খুলে হা করে রইল। অর্থাৎ আমি আরো পিঠা খাবো। তার এ কৌশল বেশ কাজে লাগলো। মানব সন্তান তাকে আরো পিঠা দিলো। তার মনে আর ভয় নেই। এরা দু'জনই পরস্পরের ভাষা ঠিকভাবে বুঝে নিয়েছে। তবে সবকিছু নয়।

সালামান মহিলাকে বললো ঃ "এখন গিয়ে ঐ শরবৎটি আনো!" মহিলা গিয়ে বড় হাত ব্যাগ থেকে কয়েক বোতল শরবৎ নিয়ে এলো। এরপর গ্লাসে ঢেলে একে একে সবাই ছেলেটির সামনে শরবৎ খেলো। এরপর ছেলেটির জন্য একটি আলাদা বাটিতে মহিলা নিজ হাতে শরবৎ ঢাললো এবং তার সামনে রাখলো। সে এবার নির্ভয়ে পুরো বাটি শরবৎ খেয়ে নিলো। তার কাছে বেশ মজা লাগছিল।

তবে ছেলেটিকে যে শরবৎ দেয়া হলো ওতে ঘুম পাড়ানোর ওষুধ মেশানো ছিল। তারা মনে করেছিল সে এক বাটি থেকে অল্প কিছু খেলেই ঘুমিয়ে পড়বে। তখন



www.pathagar.com

তাকে কাঁধে তুলে সহজে কিশতিতে নেয়া যাবে। কিন্তু সে যে সবটুকুন খেয়ে ফেলবে এ ধারণা কেউ করেনি। সে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। মহিলা এবার এসে তাকে কোলে তুলে নিলো এবং বললো ঃ "এবার মায়ের দায়িত্ব আমার। এতোক্ষণ ভালয় ভালয় কেটেছে।"

সবাই ফিরে এলো কিশতিতে। কুকুরও পিছু পিছু এলো। কিশতিতে গরম পানি করা হলো। মা তার ছেলেকে আদর-যত্ন করে গোসল করালো। সে তখনো গভীর ঘুমে। তার লম্বা লম্বা জটাধারী চুলগুলো সুন্দর করে ছেটে ছোট করে দিলো। হাত পায়ের নখ কাটা হলো, তার গায়ে পড়ানো হলো আরামদায়ক পোশাক। একটি খালি কামরায় তাকে নরম বিছানায় শুয়ে দেয়া হলো। একই রুমে তার কুকুরটিকেও রাখা হলো। এরপর ছেলে ও তার কুকুরের জন্য কিছু খাবার দাবার ও পানির ব্যবস্থা করলো সেখানে। কুকুরটিকে একটু দূরে গলায় রশি দিয়ে বেঁধে রুমের দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। শুধু একটি জানালা খোলা রাখা হলো যেনো অনায়াসে মুক্ত বাতাস আসতে পারে। এরপর সবাই চলে গেলো খেয়ে দেয়ে ঘুমানোর জন্য। সবাই আজকের এ অভিযান নিয়ে গল্প-গুজবে মেতে উঠলো। তারা এ বন্য ছেলেটি সম্পর্কে অনেক কিছুই বুঝতে পারলো তবে বহু কিছু এখনো তাদের অজানা রয়ে গেলো। অজানা বিষয়ে তাদের নানা ধারণা ও অনুমান প্রকাশ হতে লাগলো।

সালামান বললো ঃ এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, এ বালক শিশু বয়েস থেকেই এ দ্বীপে বসবাস করছে। সে যা কিছু বুঝছে সবই আল্লাহর দেয়া আক্কেল-বুদ্ধির মাধ্যমে বুঝেছে আর এভাবেই বড় হয়েছে। তার যেহেতু কোন সঙ্গী-সাথী ও সমভাষী কেউ ছিল না এবং পশুদের সাহচর্যে বড় হয়েছে সেহেতু কথা বলা শিখেনি অথবা কথা বলা ভুলে গেছে।

আরমান বললো ঃ তোমার কথা ঠিকও হতে পারে। আমাদেরও একটি ছোট ভাই ছিল। চৌদ্দ বছর আগে সাগরে আমাদের কিশতি ডুবে গেলে তার দোলনাসহ সে ভেসে যায়। তাকে আমরা আর খুঁজে পাইনি।

আবসাল বললো ঃ তার তখন বয়স কতো ছিল?

আরমান ঃ এক বছর।

রসিক লোকটি বললো ঃ এটা অসম্ভব যে, এক বছরের ছেলে দরিয়ার তুফানে পড়ে


www.pathagar.com

ভাসতে ভাসতে দ্বীপে পৌঁছতে পারবে এবং বেঁচে থাকবে।

মহিলা ঃ আল্লাহর কুদরতের লীলা বুঝা দায়! তার কাজ আরো বিস্ময়কর।

নির্দয় লোকটি বললো ঃ যত কুদরতের কথাই বলো না কেনো এক বছরের শিশু এভাবে নাজাত পেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। চিন্তা করে দেখো সে শিশু যে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারে না। সেখানে কোথায় উপকূল আর কোথায় একাকী বেঁচে থাকা। তবে হ্যাঁ আল্লাহ চাইলে কী না পারেন! আমাদের আক্কেলে তা বুঝা দায়। আচ্ছা বলো দেখি তোমার ঐ ভাইটির গায়ে কী কোন চিহ্ন ছিল না?

আরমান ঃ কেনো, নিশ্চয়ই থাকবে। তবে আমার মায়ের স্মরণ থাকতে পারে। সে এখনো বলে, জীবনের শেষ দিনও যদি তার দেখা পায় তবে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে! মায়েরা হয়তো এরকমই।

সালামান ঃ বেশ ভাল কথা! পরে দেখা যাবে। দরিয়াতে এসব আজব আজব ঘটনা বহু ঘটে থাকে। আমরা এ পর্যন্ত বহু দ্বীপেই এ ধরনের অনেক বিস্ময়কর মানুষ খুঁজে পেয়েছি। এখন এ ছেলে ঐ ছেলেই হোক বা না হোক তাতে যায় আসে না। আদম সন্তান আদম সন্তানই।

আরমান ঃ যদি ধরেও নেই যে এই ছেলেই আমাদের ভাই এবং আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তবে তা যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সে যে বন্য পশুর মতোই বন্য।

আবসাল ঃ না, ডরের কিছুই নেই। হয়তো ছয় মাস পর্যন্ত তার মাঝে বন্যতা থাকবে। এরপর সব কিছু শিখে নেবে। একে মোটেও বলা যায় না যে সেও পশু। কোন্ পশু খুঁজে পাবে যে নিজে নিজে ঘর বানাতে পারে?

একজন জবাব দিলো ঃ কাক, কবুতর, বাবুই, মৌমাছি এরা সবাই বাসা বানাতে পারে।

আরেকজন বললো ঃ পিঁপড়েদেরও ঘর আছে।

আবসাল ঃ বাহ্‌বা! এরাও যে মুখ খুলেছে। এ দু'জন যে বোবা মানুষ ছিল। এদের মুখেও এবার কথা ফুটে গেছে। তাহলে এবার তোমাদের সাথেই কথা বলবো। কোন কোন পশুপাখি না হয় নিজেদের জন্যে ঘর বানায়। কিন্তু সে সবই ওদের অভ্যাসগত ও সহজাত ব্যাপার। এদের মাঝে কোন ধরনের উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঘর বানানোর কথা না হয় বাদই দাও। এবার বলো কোন্ প্রাণী অন্য প্রাণীর কণ্ঠ নকল করতে পারে?



www.pathagar.com

ওরা বললো ঃ বানর, তোতা, ময়না।

আবসাল ঃ বেশ ভাল কথা! কোন্ প্রাণী বুঝে যে শোবার ঘরে প্রস্রাব-পায়খানা করা ঠিক না?

– বিড়াল।

– কিন্তু কোন প্রাণীই পাথর মারা ও তীর ধনুক নিক্ষেপ জানে না।

– কেনো! বানর, ভাল্লুক এরা পারে।

এবার আবসাল বললো ঃ কিন্তু কোন প্রাণীর মাথায় এ বুদ্ধি আসে না যে, ঘরে খাবার-দাবার জমিয়ে রাখতে হবে।

তারা বললো ঃ ইঁদুর, পিঁপড়ে।

আবসাল ঃ কোন্ প্রাণী খাবার তৈরী করতে পারে এবং অন্যদেরও দিতে পারে?

– সব প্রাণীই তাদের বাচ্চাদের খাবার যোগাড় করে দেয়।

আবসাল ঃ ঠিক কথা। কিন্তু নিজেদের বাচ্চাকেই খাদ্য দেয়, অন্যদের নয়। এবার বলো কোন্ প্রাণী অন্য প্রাণীদের পোষ মানানোর জ্ঞান বুদ্ধি রাখে, নিজ ঘরের ছাদে খড়কুটা ও কাদা-মাটির প্রলেপ দেয়, পোশাক তৈরী করে গায়ে দেয়, আগুন জ্বালায়, খাদ্য রান্না করে, জমিতে বীজ বুনে, মাটির হাঁড়িপাত্র তৈরী করে, তীর-ধনুক বানায় এবং সবচেয়ে বড় কথা নানা কিছুর ছবি ও ভাস্কর তৈরী করে এবং পাথরের গায়ে ছবি এঁকে এঁকে নিজের জন্য পাথরের পুস্তক বানিয়ে ফেলে?

রসিক লোক বললো ঃ "আর আমার মুখে মিষ্টি গুঁজে দেয়!"

সবাই একসাথে হেসে উঠলো।

সালামান বললো ঃ আমার লক্ষ্য এই যে, ইবনে ইয়াকজান যেনো এ ছেলেটির প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না তাকায় এবং না বলে যে, সেও পশু। যদি সে কালো হয়ে থাকে তবে হযরত লোকমান হাকিম (আঃ)-ও কালো ছিলেন। কিন্তু লোকমানের জ্ঞান প্রজ্ঞা দুনিয়া জোড়া খ্যাত। অক্ষর জ্ঞান যদি এর না থেকে থাকে তবে হয়তো হযরত আদম (আঃ)-এরও কোন অক্ষর জ্ঞান না থাকতে পারে। প্রতিটি মানুষেরই হয়তো কোন না কোন দিকে অপূর্ণতা থাকতে পারে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে সঠিকভাবে কাজ করতে হবে। এই বন্য ছেলেটিও হয়তো একদিন পরিবারের ও সমাজের জন্যে গৌরবের পাত্র হতে পারে।

রসিক লোকটি বললো ঃ আমার ধারণা, আবসালের মতলব হচ্ছে এই ছেলেকে



www.pathagar.com

এখনি নিজ সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া। তাই তার খুব পক্ষ নিচ্ছে।

আবসাল ঃ বাধা কিসের! সে এখন থেকেই না হয় আমার পুত্র কিংবা ইবনে ইয়াকজানের ভাই! আপত্তি কোথায়?

কথা সবার ফুরিয়ে আসছিলো। হঠাৎ সেই নির্দয় লোকটি বলে বসলো ঃ মানব সন্তান যদি সব কিছুই বুঝে থাকবে তবে ভাষা ও লেখনী কেনো আবিষ্কার করলো না?

আবসাল ঃ কেনো করলো না! এ জন্যে যে, তার কোন প্রয়োজনই ছিল না এতে। এসব কিছু মানব জাতি হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনের তাগিদে অর্জন করেছে। এই ছেলেও যদি হাজার হাজার বছর বাঁচে এবং একাকী না থাকে তবে সেও সবকিছু নতুন করে নির্মাণ করতে সক্ষম হবে। সে এখনো ভাষা জানে। তবে পশুদের কাছ থেকে শুনেছে বলে পশুদের মতোই শব্দ করে। সে লিখতেও পারে। তবে বিভিন্ন কিছুর আকার আকৃতি ও ছবি দেখে তা শিখেছে যেমন করে আমরাও যা দেখেছি, শুনেছি এবং বেশী করে প্রয়োজন বোধ করেছি তা শিখে নিয়েছি। তুমি কেনো আরবী জানো না, ইবনে ইয়াকজান কেনো জাপানী জানে না, আমি কেনো তিনটি ভাষা জানি, দশটি ভাষা জানিনে, আমার বাবা কেনো পড়তে জানে কিন্তু লিখতে জানে না? এসবই প্রয়োজন ও প্রশিক্ষণ অনুসারে শেখা হয়। একটি বাচ্চা শিশু ছয় মাসের মাঝেই কথা বলা শিখে ফেলে এবং কয়েক বছরের মাঝেই লিখতে ও পড়তে জানে। সেও আদম সন্তান, মানুষ। সে-ও শিখে নেবে। হয়তো বা একদিন অনেক কিছুই জানবে ও তৈরী করবে যা তোমার মাথায় ধরবে না।

সবাই আবসালের কথায় সায় দিলো। সে রাতে সবারই শান্তিতে ঘুম হলো।

পরদিন আদম সন্তানের ঘুম ভাঙ্গলো। দেখতে পেলো সে এক অজানা জায়গায় রয়েছে। যদিও জায়গাটা বেশ আরামদায়ক তথাপি মুক্ত নয়। তার পরিচিত সামগ্রীর ভেতর কিছুই এখানে নেই একমাত্র প্রিয় কুকুরটি ছাড়া। সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং ছোট খিড়কী দিয়ে পরিচিত দরিয়া ও দ্বীপটি দেখতে পেলো। তার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। সে ভাবলো নিশ্চয়ই তার আকৃতির লোকজন আশপাশে কোথাও রয়েছে। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না কী করবে। তার প্রচন্ড ক্ষুধা লেগেছে। বিছানার পাশেই দেখতে পেলো খাদ্য দ্রব্য সাজানো রয়েছে। সে কিছু খেলো। পুনরায় বিছানায় বসলো। পাশেই দেয়ালে একটি আয়না ছিল। ওতে তাকিয়ে দেখলো তার চেহারাই বদলে গেছে। চুল আর আগের মতো উসকো-খুসকো


www.pathagar.com

ও বড় নয়। বেশ সুন্দর হয়ে গেছে তার চেহারা। হাত পায়ের নখও বেশ ছোট হওয়ায় অনেক আরাম পাচ্ছে। তার আগের অবস্থার চেয়ে এখন সে অনেক সুন্দর ও ভাল হয়েছে। তবে তার প্রিয় কবুতরগুলো, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, ঘরকে দেখতে পাচ্ছিল না বলে মনটা ছটফট করতে লাগলো। সে এখন তার বিশাল দ্বীপের মুক্ত মানুষ নয়, একটি ঘরে, তাও কী না দরিয়ার উপর বন্দী হয়ে আছে। সে ভাবছে ঃ "যাই হোক না কেনো এরা খারাপ প্রাণী নয়, এরা আমারই মতো। এরা আমাকে কী যেনো বলছে কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এদের কথা শিখে নিলে বেশ ভালই হবে। এখন কেমন হয় ওদের যদি বুঝিয়ে দেই যে, সকাল হয়ে গেছে, জেগে উঠা দরকার?"

সে তো সকালবেলায় মোরগের ডাকে জেগে উঠতো। তখনি সে 'ককেকোক কো...' বলে উচ্চস্বরে ডেকে উঠলো। মোরগের এ ডাক শুনে কিশতির আরোহীরা সবাই জেগে উঠলো। কিশতিতে কোন মোরগ ছিল না বলে ওরা সহজেই ব্যাপার কি বুঝে ফেললো। আদম সন্তান দরজার পাশে গিয়ে একটিপর্দা সরাতেই কাঁচের জানালা দিয়ে দেখতে পেলো যে, সেই লোকজন জেগে উঠেছে এবং ঘুমের কাপড় চোপড় বদলিয়ে পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে হাত মুখ ধুচ্ছে। তারা বললো ঃ "ওই ঘরের দিকে কেউ তাকিয়ো না। তাকে দেখতে দাও আমরা কী করছি। তাহলে সে তাড়াতাড়ি জীবন যাত্রার আদব-কায়দা শিখে ফেলবে।" কতক্ষণ পর এসে তারা কামরার দরজা খুললো এবং ছেলেটিকে নিজেদের কামরায় নিয়ে গেলো।

সকালের নাস্তা সেরে তারা আরেকবার তাকে সহ কিশতি থেকে দ্বীপে গিয়ে নামলো। তাদের ইচ্ছা ছেলেটি যা যা পছন্দ করে তা জমা করে কিশতিতে নিয়ে আসবে। ছেলেটি এখন সুবোধ বালকের মতোই তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে শান্তভাবে পথ চলছে। ঘরে পৌছে সে আগুনে পুড়ানো একটি গোল আলু ও এক টুকরা গোশত পড়ে থাকতে দেখে তা মুখে পুড়ে খেতে চাইলো। কিন্তু না, মজা না লাগায় ফেলে দিলো। দু'একবেলা ভাল ভাল খাবার খেয়ে এখন আর তার কাছে নিজের তৈরী খাবারই ভাল লাগছে না। কিশতির কামরাগুলো দেখে এখন আর তার নিজের মাটির কুটিরটিকে ভাল লাগছে না। তাকে তার ঘরের ভেতর ছেড়ে দেয়া হলো। তারা দেখলো এখন আর সে পালাতে চাচ্ছে না। সে এখন তার নিজ জাতিকে চিনে ফেলেছে। মানব সন্তান কখনো নিজ জাতি ছেড়ে পশুপাখিদের সাথে



www.pathagar.com

জীবনযাপন করতে চায় না। কেননা সে যে এই মানুষ থেকে ভাল আচরণই পেয়েছে ও দেখেছে।

সবাই বললো ঃ "চলো. ফিরে যাই। আমাদের আর কোন কাজ নেই এখানে।" তারা ছেলেটিকে আঙ্গুল দিয়ে কিশতির দিকে ইশারা করলো। সে জানতো যে, ঐ জায়গা অনেক ভাল ও আরামের এবং এই লোকজনও তার প্রতি স্নেহপরায়ণ ও বন্ধু বৎসল।

সবাই কিশতিতে ফিরে গিয়ে কিশতি ছেড়ে দিলো। সেই দিন থেকেই তারা ভাষা জ্ঞানহীন মেহমানকে শিক্ষা দান শুরু করলো। মানুষের এই সন্তানকে শিক্ষা দান বেশ সহজ হয়ে পড়লো। সবাই তার সামনে চর্চা ও অনুশীলন করতো। সে সবই বুঝতো ও শিখে নিয়ে মুখে মুখে আউড়াতো।

সালামান আবসালকে বলতো ঃ "যাও!"

সে উঠে যেতো। আবার বলতো "আস!" সে ফিরে আসতো। বলতো "বস"। সে বসতো। এগুলো বারবার পুনরাবৃত্তি করায় ছেলেটি শিখে ফেললো। রুটি ও কেক হাতে নিয়ে এক দুই তিন করে গণনা শিখে ফেললো।

এভাবে কিশতিতে যে সময় পার হলো তাতে সে মোটামুটি সবকিছুই শিখে ফেললো। এখন সে কথা বলতে পারে। তবে তার সকল চিন্তা-ভাবনা ও আবেগ-অনুভূতি এবং অতীত জীবনকে ভাষার মাধ্যমে বলতে পারে না। এ অভিজ্ঞতাও সে কিছুকাল পরে শিখে নিলো। ঠিক যেমন সমাজের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা শিখে নেয়।

তারা যখন শেষ পর্যন্ত নিজেদের শহরে গিয়ে পৌঁছলো তখন তাদের ঝড়-তুফানের কবলে পড়া, অজানা দ্বীপে পৌঁছা ও এক মানব সন্তানকে সেখান থেকে উদ্ধারের কাহিনী বিদ্যুৎ গতিতে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লো। উদ্ধারকৃত ছেলেটিকে আবসাল তার বাড়িতে নিয়ে গেলো। আরমান তার বাড়ি পৌঁছে সব কাহিনী মজা করে বললো। কিন্তু তার মা এ কাহিনী শুনে হঠাৎ ছটফট শুরু করলেন। তিনি বললেন, "আমি আজই এ ছেলেকে দেখতে যাবো, এক্ষুণি আমাকে নিয়ে চল। আমার মন বলছে, এ আমারই ছেলে, আমারই হারিয়ে যাওয়া সোনা মানিক!"

খোদ ইয়াকজান এখন বৃদ্ধ হওয়ার পথে। তার স্ত্রীরও চুলে পাক ধরেছে। পুত্র আরমানের বয়েস ২৯ বছর এবং তাদের কন্যা অর্থাৎ আবসালের স্ত্রীর বয়স ২৬ বছর। তাদের জীবন ভালই চলছিল। কিন্তু মা প্রায়ই কচি ছেলেটির কথা মনে করে


www.pathagar.com

গুনগুনিয়ে কাঁদতো।

মায়ের পীড়াপিড়িতে সবাই এলো জামাইর বাসায়। ছেলেটিকে কাছ থেকে দেখলো। মা বললেন, "সব কিছু বদলে গেছে। কিন্তু চোখ দু'টি চেনাচেনা লাগছে। মা অস্থির হয়ে পড়লেন। ছেলেটিকে কাছে নিয়ে ঝটপট তার গায়ের জামা খুলে বাম পাশের পাঁজর পরখ করে দেখলো। হ্যাঁ সেইতো! মা চিৎকার করে উঠলো, "এ যে আমার ছেলে! হাই বিন ইয়াকজান! দেখো তোমরা! এখনো তার পাঁজরে ছোটবেলার সেই পোড়া দাগটি রয়ে গেছে।" সাথে সাথে মা ছেলের ডান কানের পেছনের দিকে তাকিয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো এবং বললো ঃ "এই যে, তার কালো তিলটা!" এই বলে মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বুক ফাঁটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। ছেলেটিও ঘটনার অনেক কিছু বুঝতে না পারলেও মায়ের বুকের উষ্ণতা ও চোখের গরম অশ্রুর পরশ পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। যেনো সাত সমুদ্দুরের ভয়াল তুফান তার ছোট অন্তরে প্রলয়ের সৃষ্টি করছে। তার চোখ বেয়ে অঝোরে ঝরছে অশ্রু ধারা। সে কিছুই বলতে পারছে না। শুধু একবার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো ঃ ''মা, মাগো''! এরপর মাথা এলিয়ে মায়ের বুকে আশ্রয় নিলো। সবাই তখন কাঁদছে, সবার চোখে পানি। মা অস্থিরভাবে একের পর এক ছেলের মাথায়, চোখে মুখে চুমু খেয়ে খেয়ে বলতে লাগলো ঃ "বাপ আমার! সোনা মানিক আমার! কোথায় ছিলিরে এ অভাগিনীকে ছেড়ে! আমার কালো মানিক– আমার যাদু..." এ কথা বলতে বলতে মা বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

ছেলেমেয়েরা দৌড়ে এসে মাকে ধরলো। তাদের চোখে আনন্দের কান্না ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে। তারা তাড়াতাড়ি মায়ের চোখমুখে ঠান্ডা পানির ছিটে দিয়ে ও পাখার বাতাস করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো। ধীরে ধীরে সবাই কেঁদে কেটে হালকা হলো। মা বললেন ঃ "আমি জানতাম, আমার বাচ্চা আছে, মরেনি। আমি যে তাকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়েছিলাম।"

ছেলে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বললো ঃ "মা! মাগো, তোমায় কতো খুঁজেছি আমি। বনে-বাদাড়ে, মাঠে-ঘাটে শুধু তোমাকেই মন-প্রাণ দিয়ে খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও তোমার খোঁজ পাইনি। কিন্তু আমার মনও বলতো নিশ্চয় অন্যান্য পশুপাখির মতো আমারও মা আছে, কিন্তু আমার মা যে কেমন তা জানতাম না, কোথায় তাও জানতাম না। আল্লাহ আমাদের মিলিয়ে দিলেন।"


www.pathagar.com

এরপর সবাই তাদের অতীত কাহিনী বলতে শুরু করলো। বাবা ইয়াকজান বহুকাল হলো সমুদ্র যাত্রার কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। সে যাত্রা রক্ষা পাওয়ার পর থেকে শহরেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আবসালের কাছে একমাত্র মেয়ে সারাকে বিয়ে দেন। আর পুত্র আরমান ভগ্নীপতি আবসালের সাথে ব্যবসায় শরীক হয়ে কাজ করতো। পরে আরমান প্রায়ই বলতো, "আমিই আমার ছোট ভাইকে অজানা দ্বীপ থেকে উদ্ধার করে এনেছি।"

এদিকে ভগ্নীপতি আবসাল ও বোন সারার কোন সন্তান ছিল না। তাই তারা ছোট ভাই হাই বিন ইয়াকজানকে লালন-পালনের দায়িত্ব হাতে তুলে নিলো। ছেলেটি শহরের স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলো। আর শেষ পর্যন্ত সে এক মহা পণ্ডিত ও যুগসেরা বিজ্ঞানীতে পরিণত হলো। দেরীতে লেখাপড়া শুরু করলেও অসাধারণ প্রতিভা, প্রবল আগ্রহ ও অপরিসীম অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু দুর্গম পথ সহজ ও তরান্বিত করে নিলো। সে প্রমাণ করে দিলো যে, জ্ঞান অর্জনের জন্যে কখনো দেরীতে ও বিলম্বে শুরু করাটা বড় ব্যাপার নয়। মানুষের চেষ্টা হওয়া উচিত সুযোগ পাওয়া মাত্রই অবিলম্বে কোমর বেঁধে নামা।


www.pathagar.com

## লেখক পরিচিতি

### মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান
(লেখক, সাংবাদিক, গবেষক ও অনুবাদক)

**জন্ম ঃ** ১৯৫০ একুশে ফাল্গুন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর থানাস্থ বিটঘর গ্রাম। '৭৫ ও '৭৬ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও মাষ্টার ডিগ্রী লাভ। '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত ঢাকার দৈনিক দি পিপল পত্রিকার সাব-এডিটর। '৭৭ থেকে '৯৬ পর্যন্ত ইরান অবস্থান। রেডিও তেহরানের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (১৯৮২-৯৬)। ইসলামী রিপাবলিক পার্টির ইংরেজি সাপ্তাহিকীর সম্পাদক ও তেহরান ইকোনোমিষ্টের সহযোগী সম্পাদক। '৯৬-এর শেষ দিকে প্রত্যাবর্তন ও ঢাকায় অবস্থান। বর্তমানে বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোল্লা ছাদরার উচ্চতম বুদ্ধিবৃত্তিক ঐশী প্রজ্ঞা-দর্শনের উপর পি. এইচ. ডি কর্মে নিয়োজিত।

**পেশা ও নেশা ঃ** ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, বিশেষ করে দর্শন-প্রজ্ঞা, আধ্যাত্মিকতা ও শিশু-কিশোর সাহিত্য এবং ফার্সী কাব্য-সাহিত্য নিয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা, গ্রন্থনা, অনুবাদ ও অনুশীলন।

**ভ্রমণ ঃ** এশিয়ার অনেক দেশ।

**প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ**

**সহিফা প্রকাশনী থেকে ঃ** সুলতান মাহমুদের দাড়ি (মসনবী শরীফের গল্প), উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞা (ঐশী দর্শন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য), ইমাম খোমেনীর কবিতা, কালিলা ও দিমনা কিশোর (ক্লাসিক), হাজার মাযারের জনপদ (ভ্রমণ কাহিনী)।

**আলে এছহাক প্রকাশনী থেকে ঃ** ছোট বেলায় প্রিয় নবী (সঃ), ও রাসুলুল্লাহর প্রতি বিরোধী নেতা বুদ্ধিজীবীদের চ্যালেঞ্জ (বিতর্ক ও মুক্তালোচনা)।

**ইরান থেকে প্রকাশিত ঃ** ইমাম খোমেনীর নিজস্ব ও তাঁর উপর রচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ (অনুবাদ)। বাংলাদেশ ও ইরানের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বেতারে বাংলা, ইংরেজী ও ফার্সী ভাষায় অসংখ্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও সাক্ষাতকার প্রকাশ ও প্রচার।

**বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত (কিশোর ক্লাসিক ও শিশুতোষ) ঃ** শিয়াল ও কাক (রঙিন), ইঁদুর ছানাদের স্কুল যাত্রা (রঙিন), পশু-পাখীর গল্প-১ এবং ২, আজব শিশু (হাই ইবনে ইয়াক্যান), সাধু-শয়তান (কিশোর উপন্যাস)।

**ঢাকার অন্যান্য প্রকাশনা ঃ** রুবাইয়াত-ই-হাফেজী হুজুর, শাহাদতের আরজু, প্রেম ও প্রতিরোধের বাণী।

**মুদ্রণের অপেক্ষায় ঃ** শিশু-কিশোরদের জন্য অনেক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, জ্ঞানতত্ত্ব (ইসলামী প্রজ্ঞা দর্শনের আলোকে), ইসলামী দর্শনে কার্যকারণ বিধি, হজ্জ্ব সফরের অভিজ্ঞতা (দৈনিক আল-মোজাদ্দেদে প্রকাশিত), ইরানী আরেফ ওলীদের কথা, ইমাম খোমেনীর জীবনী (বিপ্লব পূর্ব), সাদী-হাফেজ-রুমী-ফেরদৌসীর কবিতা, মসনবীর কাহিনী, শামসে তাব্‌রিজীর প্রেমে (পীরের প্রেমে), গুলিস্তান ও বুস্তানের কাহিনী, রাসুলুল্লাহর সমকালীন মুর্তাদ বুদ্ধিজীবীগণ (দৈনিক আল মুজাদ্দেদে প্রকাশিত), ইহুদীদের ইতিহাস ও ফিলিস্তিন সংগ্রাম, মোল্লা ছাদরা ও তাঁর উচ্চতম ঐশী দর্শন, পশ্চিমা খাদ্যাভ্যাস আধুনিক রোগ-শোকের কারণ (স্বাস্থ্য বিষয়ক)।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com